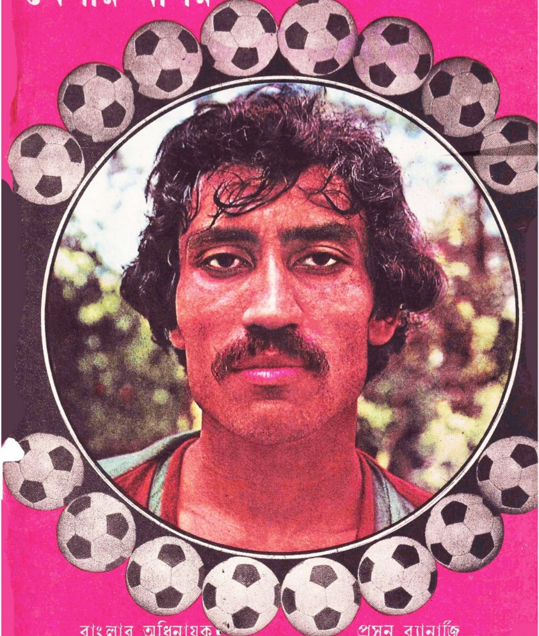
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯

খেলার আসর



বাংলার অধিনায়ক : প্রসূন ব্যানার্জি



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



Cadbury's
MILK
CHOCOLATE
Cadbury's
FRUIT & NUT
MILK CHOCOLATE
Cadbury's
CRACKLE
MILK CHOCOLATE
CADBURY'S CRACKLE MILK CHOCOLATE
প্রকৃতির সব সেরা জিনিসের স্বাদ
খাঁটি দুধের প্রকৃত স্বাস্থ্যগুণ। সেরা জাতের আখের মিহি চিনি। অত্যন্ত ভালো জাতের কোকো বীন! একমাত্র ক্যাডবেরী'ই জানে এসবের সুন্দর মিশ্রণ করে ক্যাডবেরীস্ মিল্ক চকলেট বানাতে। যে চকলেটের স্বাদ অপূর্ব! কখনো ভোলা যায় না! যেমনই মোলায়েম, তেমনই মালাইদার। আর কত নানান রকমের চমৎকার সুস্বাদু চকলেট।
প্রত্যেক টুকরোয় দুধের পুষ্টি
Cadbury's
NUT MILK
CHOCOLATE
Cadbury's
PINEAPPLE
FLAVOURED
MILK CHOCOLATE
oranjello

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ৩২ ॥ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯

বোম্বাই টেস্টে ভারতের জয় ক্রিকেটে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে অনেকে মনে করতে পারেন। বিশেষ করে গত বছর পাকিস্তান সফরে ভারত দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে পরাজিত হয়। এখনও অবশ্য ভারত সফররত পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের শক্তি সম্পর্কে খোলাখুলি মত প্রকাশের সময় আসেনি। দিল্লি টেস্টে ভারতের জেতার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। সময় অভাবে সেটা আর হয়নি। বোম্বাইতে প্রথমদিন থেকেই ভারত খেলার ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। সাময়িক ব্যাটিং বিপর্যয় হলেও অবস্থাটা সামলে যায় শেষের দিকের ব্যাটসম্যানদের তৎপরতায়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় পাকিস্তান পিচের দুর্বোধ্য আচরণের শিকার হয়। শেষ দিনে পাকিস্তান ভাল বোলিং করলেও পিচের আচরণ ভারতের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সুবিধেজনক হয়। আরও তিনটি টেস্ট রয়েছে। পাকিস্তানের অধিনায়ক আশা ব্যক্ত করেছেন যে পাকিস্তানের প্রত্যুত্তর দেওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়নি। আমরা উজ্জ্বল ক্রিকেটের প্রত্যাশায় রইলাম।

সম্পাদক : অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা : ১·৫০
বিমান মাশুল :
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা



যা আছে

ক্রিকেট :

বিশেষ রচনা :

ফুটবল :

অন্যান্য :

প্রচ্ছদের ছবি : অরুণ মুখার্জি

অন্যান্য ছবি : পাহাড়ী রায়চৌধুরী, সন্তোষ ঘোষ, শঙ্কর নাগ দাস, অরুণ মুখার্জি, শ্রেণীক শেঠ প্রমুখ



ভারত-পাকিস্তান

তৃতীয় টেস্টে জয়পরাজয় একই সুরে বাঁধা ছিল

বোম্বাই থেকে শ্যামল শ্যাম

ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট নানা কারণে ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে। এটা শুধু আমার মত নয়, প্রায় সকল ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞরা, যারা বোম্বাই-এ সমবেত হয়েছিলেন তাদের সকলেরই। পিচের আচরণ যে এরকম দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে ক্রমশ, সেটা চতুর্থ দিনে ভালভাবে বোঝা গেলেও প্রথম দিনের খেলায় তার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাত্র কদিন আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ টেস্টে গাভাসকর টসে জিতে যে সুবিধে পেয়েছিলেন সেটা ভারতের সহজ জয়ের পক্ষে নানা দিকে সুবিধেজনক হয়। কাজেই পাকিস্তানের বিপক্ষে গাভাসকর যখন টসে জয়ী হলেন আমাদেরও ওই রকম ধারণা হয়েছিল। কিন্তু জয় কোন পথে আসতে পারে সেটা মোটেই ধারণা করা সম্ভব হয়নি। অথচ চতুর্থ দিনে কি কাণ্ডই না ঘটে গেল। একদিনে ১৭টি টেস্ট উইকেট পড়ল। পাকিস্তান প্রায় মরীয়া আর বেপরোয়া খেলে হেরে গেল। মরীয়া আর বেপরোয়া বলছি এই কারণে যে, যেখানে চতুর্থ দিনের সকালে ভারতের সাতটি উইকেট ৪৩ রানে পড়ে সেখানে। পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে মার মার করে খেলে ১০ উইকেটে ১৯০ রান করে আউট হল।

চতুর্থ দিনে ভারত কখন ইনিংস ডিক্লেয়ার করবে, গাভাসকর কত রান হাতে থাকলে আশ্বস্তবোধ করতে পারেন এসব 'হিসেবের' আর কোন প্রয়োজনই হল না। তবে উইকেটের আচরণ এটাও বলে দিল যে পাকিস্তানের নিস্তার নেই এই টেস্টে। কারণ চতুর্থ দিনের সকালে ইকবাল কাশিম ৪.৩ ওভার বল করে মাত্র তিন রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট দখল করে টেস্ট ক্রিকেটে একটা ভাল রকম নজীর গড়ে রাখলেন। অবশ্য ওয়াংখাড়ের উইকেট ইকবালকে সাহায্য করেছে। যেমন করেছে দোশি, ঘাউড়ি, কপিল ও শিবলাল যাদবকে।



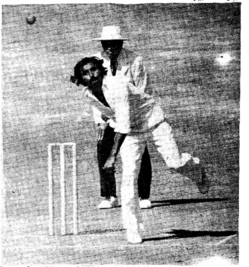
ঘাউড়ি যখন বল করেন/সমর তরফদার

তৃতীয় দিনের শেষে কিন্তু দুই অধিনায়ক আসিফ ইকবাল ও সুনীল গাভাসকর প্রায় একই সুরে; একই ভাষায় উইকেট তৈরি করা নিয়ে তীব্র সমালোচনাই শুধু করেননি। ব্যঙ্গোক্তি করে গ্রাউণ্ডসম্যানকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য সুপারিশ করলেন ভারতের অধিনায়ক। অথচ চতুর্থ দিনের খেলার শেষে বোর্ডের সম্পাদক গোলাম আমেদ সব অভিযোগ নস্যাৎ করতে চাইলেন। এটা স্বীকার করলেন না যে ভারতের সাতটি উইকেট মাত্র ৪৩ রানে পড়ে যাওয়া নিছক খারাপ ব্যাটিং-এর জন্য নয়। পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে কয়েকটি এল বি ডবলিউ আউট আমাদের মনে সন্দেহ যদি জাগায় তবে সেটা নিছকই নিন্দুকের মনোভাব বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে জাভেদ মিয়াদাদের আউট একথা মনে করিয়ে দিতে পারে। মিয়াদাদকে আউট না দিলে পাকিস্তান জিততে পারত অথবা ম্যাচ বাঁচাতে পারত এটা বলছি না। কারণ উইকেট নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি।

খেলার কথায় ফিরে আসি। প্রথমদিন ভারতের প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বেঙ্গসরকর ও বিশ্বনাথ কিছু রান করে আউট হয়ে যাওয়ার পর একটা ধ্বস নামে। কিরমানি ও কপিলদেব কাঁধে তুলে নেন ভারতের ইনিংসকে, যখন তারা পাকিস্তানের বোলারদের বেধড়ক ঠেঙালেন। দিনের শেষে অপরাজিত কিরমানির ৩৯ ও কপিলের ৫৭ ভারতের ইনিংসকে মর্যাদা দেয়। পরের দিন কারসন ঘাউড়ি ও শিবলাল যাদব একই ভাবে ব্যাট চালিয়ে আসিফ ইকবালের হিসেবে গরমিল এনে দেন। বলতে গেলে দ্বিতীয় দিনের সকালেই 'পানিপথের' যুদ্ধের ভাগ্য ভারতের দিকে চলে গিয়েছিল। একথা লিখছি এই কারণে যে দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান খুব খারাপ ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১১২ রান তোলে। পাকিস্তান ওই দিনই হারে। সে তুলনায় চতুর্থদিনে তাদের বোলিং ও ব্যাটিং; এক কথায় অসাধারণ, যখন প্রতিকূল উইকেটের কথা মনে হয়। এক মুদাস্সর নজর, ওয়াসিম রাজা, ওয়াসিম বারি ও ইকবাল কাদির যা রান করলেন। তবে কেউ ত্রিশের ঘর পার হতে পারলেন না। ভারতের রজার বিনির আঘাত পাকিস্তানের প্রথম চারজনের মধ্যে তিনজনকে উইকেট থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। স্পিনার দোশি ও যাদব ৬টি উইকেট সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে বুঝিয়ে দেন যে উইকেট স্পিনারদের পক্ষেও সুবিধেজনক। এ কথাই আসিফ ও গাভাসকর জোর দিয়ে বলেন।

বিরতির পর চতুর্থ দিনের সকালে ভারতের ইনিংস গুঁড়িয়ে গেলেও ভারত জিতবে এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধে হয়নি। পাকিস্তান জানত পরাজয় আসছে অবিচল গতিতে। সময়ের কথা মনে রেখে তারা ঝামেলা বাড়াতে চায়নি। খেলার খেলা খেলেছে যখন মধ্যাহ্ন ভোজ ও চা-পানের বিরতির মধ্যে ১২০ মিনিটে ১২৫ রান তুলল তারা। উইকেটও অবশ্য সমান গতিতে পড়েছে। মজিদ ও জাহির আব্বাস এই সফরে পাকিস্তানের ব্যাটিং ক্ষমতা শক্তিশালী করতে পারছেন না, অন্ততঃ তাদের কাছে যতটা আশা আসিফ ইকবাল করতে পারেন। চতুর্থ দিনে আসিফ ও মিয়াদাদের ব্যাটিং-এ জঙ্গী মনোভাব; কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছিল মুগ্ধকর, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং বীরোচিত।

অধিনায়ক হওয়ার পর গাভাসকর এখন পর্যন্ত অপরাজিত শুধু নন তিনটি টেস্ট জয় করার দাবীদার হয়েছেন।



ইকবাল কাসিম দু ইনিংসে দশটি উইকেট/সন্তোষ ঘোষ

স্কোর

ভারত (প্রথম ইনিংস)

গাভাসকর ক কাদির বো বখত	৪
চৌহান ক বারি বো ইমরান	৫
বেঙ্গসরকর ক মজিদ বো কাশিম	৫৮
বিশ্বনাথ ক ও বো কাশিম	৪৭
ইয়াশপাল বো কাশিম	৩
বিন্নি ক বারি বো কাশিম	০
কিরমানি ক আসিফ বো বখত	৪১
কপিল ক রাজা বো বখত	৬১
ঘাউড়ি ক আসিফ বো বখত	৩৬
যাদব অপরাজিত	২৯
দোশি ক বারি বো বখত	৯
অতিরিক্ত	৩৩
মোট	৩৩৪

উইকেট পতন: ১/১০, ২/৩১, ৩/১১১, ৪/১২৯, ৫/১২৯, ৬/১৫৪, ৭/২৪৯, ৮/২৫০, ৯/৩১৭।

বোলিং: ইমরান—১৫-৭-৩৫-১, সিকান্দর—২২-১-৫-৫৫-৫, কাশিম—৪৪-১৫-১৩৫-৪, মজিদ—২৩-৮-৫২-০, কাদির—৩-১-১৬-০, আসিফ—২-১-১-০, মুদাস্সর—৫-০-৫-০।

পাকিস্তান (প্রথম ইনিংস)

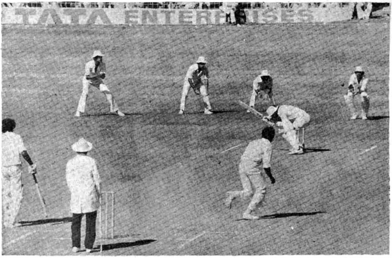
মজিদ ক কিরমানি বো বিন্নি	৫
মুদাস্সর ক গাভাসকর বো দোশি	২৫
জাহির বো বিন্নি	২
মিয়াদাদ এল বি ডবলিউ বো বিন্নি	১৬
রাজা ক বিশ্বনাথ বো দোশি	২৪
আসিফ ক ও বো যাদব	১৪
ইমরান ক গাভাসকর বো দোশি	১৫
বারি বো যাদব	২৩
কাদির অপরাজিত	২৯
কাশিম ক কিরমানি বো যাদব	০
সিকান্দর এল বি ডবলিউ বো কপিল	৩
অতিরিক্ত	১৭
মোট	১৭৩

উইকেট পতন : ১/১১, ২/১৫, ৩/৫৩, ৪/৫৭, ৫/৮৩, ৬/১০৫, ৭/১১৬, ৮/১৪৬, ৯/১৪৬।

বোলিং : কপিল—১৪·৩-৪-২৩-১, ঘাউড়ি—৭-২-১৭-০, বিন্নি—১২-১-৫৩-৩, দোশি—২৭-৮-৫২-৩, যাদব—৮-৪-১১-৩।

ভারত (দ্বিতীয় ইনিংস)

গাভাসকর ক জাহির বো কাশিম	৪৮
চৌহান বো মুদাস্সর	০
বেঙ্গসরকর ক বারি বো বখত	৪৫
বিশ্বনাথ এল বি ডবলিউ বো কাদির	৯
ইয়াশপাল ক মজিদ বো কাশিম	১৬
কিরমানি ক আসিফ বো কাশিম	১৫
কপিল ক বারি বো কাশিম	৩
ঘাউড়ি ক বারি বো কাশিম	১
বিন্নি ক ও বো বখত	০
যাদব স্ট্যাঃ বারি বো কাশিম	১
দোশি অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	২১
মোট	১৬০




তৃতীয় টেস্টের হিরো কপিলদেব/সঞ্জয় ঘোষ

উইকেট পতন—১/৫, ২/৭৮, ৩/৯৭, ৪/১৩২, ৫/১৪৬, ৬/১৫৪, ৭/১৫৬, ৮/১৫৭, ৯/১৫৭।

বোলিং : সিকান্দার—১৭-৬-৩০-২, কাশিম—২৮·৫-১৪-৪০-৬, মজিদ —৪-১-১৪-০, কাদির—১১-৫-২৭-১, রাজা—১·০-১০-০, মুদাস্সার—৮ ৩-১৮-১।

পাকিস্তান (দ্বিতীয় ইনিংস)

মজিদ এল বি ডবলিউ বো ঘাউড়ি	৭
মুদাস্সার এল বি ডবলিউ বো ঘাউড়ি	১০
জাহির বো কপিল	১১
মিঁয়াদাদ এল বি ডবলিউ বো দোশি	৬৪
রাজা ক বেঙ্গসরকর বো ঘাউড়ি	৪
আসিফ ক বিশ্বনাথ বো দোশি	২৬
ইমরান ক গাভাসকর বো ঘাউড়ি	১৯
বারি এল বি ডবলিউ বো দোশি	৩
কাদির ক বিন্নি বো যাদব	১৫
কাশিম ক বেঙ্গসরকর বো যাদব	৭
সিকান্দার অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	২০
মোট	১৯০

উইকেট পতন—১/১৬, ২/৩২, ৩/৪১, ৪/৪৮, ৫/৮৪, ৬/১৪৫, ৭/১৬১, ৮/১৭৮, ৯/১৮৯।

বোলিং : কপিল—৬ ১-২৬-১, ঘাউড়ি—১৮-৩-৬৪-৪, দোশি—১৯-৪-৪২-৩, যাদব—৬·৪-০-৩৬-২।

(ভারত ১৩১ রানে জয়ী)



॥ সানি ॥

হরদেব সাধুখাঁ

সানি মানেই সুনীল
সুনীল গাভাসকার,
বাউণ্ডারী হাঁকান তিনি
শুধুই টকাস্ চার।

সানি মানেই ক্রিকেট
ক্রিকেট মানেই সানি
এই দেশেতে এই কথাটা
সবাই এখন জানি।

সানি মানেই রেকর্ড
ক্রিকেট কিংবা গানের
উচ্ছলতায় বান ডেকে যায়
রানের কিংবা কানের।

সানি মানে কেউ যদি কও
সানি মানেই হানি
ক্ষতি বললে মানবো না তা—
মধু বললে মানি ॥

অনিবার্য কারণবশতঃ এ সংখ্যায় পাকিস্তানী ক্রিকেটের শিরোনাম রচনাটি প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

বোম্বাই-এর তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে 'সব মিলিয়ে ১৭টি উইকেটের পতন— কার্টুনিস্ট আলির তুলিতে



মাকে আমরা বিক্রি করেছি বিদেশের কাছে ঃ ধ্যানচাঁদ

হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ, অনন্য ধ্যানচাঁদ। তার সম্বন্ধে কোন জানাই শেষ জানা নয়। কোন ঘটনা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেখক বিমল ভৌমিক তার 'দাদাজী'কে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তার স্মৃতি থেকে তিনি কিছু উপহার দিয়েছেন পাঠকদের, জানিয়েছেন তার শেষ শ্রদ্ধা। বিমল ভৌমিক বাংলার প্রাক্তন হকি খেলোয়াড়, বর্তমানে হকি কোচ।

বিমল ভৌমিক ঃ দিল্লি থেকে ফিরেই সেই দুঃসংবাদ। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। কেন আরও কটা দিন থেকে গেলাম না। 'দাদাজী' নিশ্চয়ই আমার কথা মনে করেছিলেন শেষ সময়। শেষ পর্যন্ত ঝাঁসী যাওয়াই ঠিক করলাম। দাদাজীর কাজে অন্তত থাকতে পারব।

১২ ডিসেম্বর সিকরি বাজারের প্রেমগঞ্জ রাস্তার ওপর 'যাদুকরের' বাড়ীতে ভোরেই গিয়ে কড়া নাড়তে মোহনকুমার, রাজকুমার, অশোক-কুমার ও আরও চার ভাই মাথা নীচু করে দাঁড়াতে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারিনি। ঘরে দুখানি বড় ফটো॰পাশাপাশি। সামনে ধুপ আর ধুনো জ্বলছে। ধ্যানচাঁদ আর রূপ সিং ফ্রেমে বাঁধা। টেবিলের ওপর অজস্র টেলিগ্রাম ও চিঠি। 'দাদাজী'র প্রতি সকলের শেষ শ্রদ্ধা।

ভাবিজী (ধ্যানচাঁদের স্ত্রী) আমায় দেখে মুখ ঢাকলেন। দিল্লির হাসপাতালে দেখা হয়েছিল। চোখের জল রাখা দায়। ছেলেরা সব কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। ভাবিজী বললেন, 'রোজ রক্ত নিয়ে যেত তোমার দাদাজীর জন্য। 'ভাবতাম ভাল চিকিৎসা হচ্ছে। খেতে পারতেন না বলে নল দিয়ে খাওয়াতো ওরা। খুবই আশা ছিল। প্রথমে বললে নিউমোনিয়া হয়েছে। কাশির সঙ্গে সর্দি আমরা গলা থেকে বার করতাম। অথচ ৩০ নভেম্বর ডাক্তার জানালেন যে পেটে ক্যান্সার হয়েছে। অন্য ঘরে দাদাজীকে ওরা নিয়ে গেল।' মনে আছে ২৯ নভেম্বর 'দাদাজীর' বেড কার্ডে লেখা আমি ও প্রদীপ ব্যানার্জি দেখেছি ; 'অবস্থা ভালই।' ছেলেরাও হাসপাতালের চিকিৎসার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন।

ছেলেদের কাছেই শুনলাম যে 'যাদুকরে'র দেহান্তের পর যখন ঠিক হল ঝাঁসীতেই শেষ কাজ করা হবে তখন এশিয়ান গেমসের সর্বময় কর্তা বিজয় মালহোত্রা হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বহুগুণাজীও এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন বলে অশোককুমার জানালেন। তারা দুজনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ঝাঁসীতে হেলিকপ্টার নামতেই দুজন ব্রিগেডিয়ার সহ অনেক জোয়ান সামরিক কায়দায় দাদাজীর মরদেহ বয়ে নিয়ে যান ঝাঁসীর প্রেমগঞ্জের বাড়ীতে। সারা ঝাঁসী ভেঙে পড়েছে। আবালবৃদ্ধবনিতা রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে। তাদের বড় আপনজন আজ চলে গেলেন। শেষবারের মত তারা যাদুকরকে শ্রদ্ধা জানাতে চান। সারা রাত বাড়ীর সামনে সকলেই রইলেন। হাজার হাজার নরনারী 'যাদুকরে'র বড় প্রিয় ঝাঁসী হিরোজ মাঠের মধ্যেই রাত কাটালেন। ঝাঁসী হিরোজ মাঠ ধ্যানচাঁদের বাড়ী থেকে দু মিনিটের রাস্তা। সামরিক পুলিশ, কালেক্টররাও সব সারা রাত 'যাদুকরের' দেহ পাহারা দিলেন। ঝাঁসী সেদিন 'বন্ধ' ছিল। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ গেল না। তাদের জীবনে এত বড় শোক আর আসেনি।

ধ্যানচাঁদের মরদেহ কোথায় দাহ করা হয়েছিল এ প্রশ্নের জবাবে



ঝাঁসীর বাড়ীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া পুরস্কারের কয়েকটি

অশোককুমার বললেন, জনসাধারণ দাবী করলেন যে ঝাঁসী হিরোজ মাঠের এক পাশে হোক। কিছু আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু কংগ্রেস (ই) নেতা ব্রিজমোহন শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে মাঠের এককোণে দাহ করার ব্যবস্থা করেন। বেলা ১২টার সময় মরদেহ নিয়ে এক বিরাট জনতা সারা ঝাঁসী পরিক্রমা করলেন। দাহ করার আগের মুহূর্তে এক ব্রিগেডিয়ার তিনটি গুলি ছুঁড়ে সামরিক কায়দায় ধ্যানচাঁদকে শেষ বিদায় জানালেন। মোহনকুমার মুখাগ্নি করলেন। এখন ওই জায়গাটি পাঁচ ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা রয়েছে। ওই মাঠেই ধ্যানচাঁদের নামে স্টেডিয়াম হবে। এসবই ধ্যানচাঁদের ছেলেরা বললেন আমায়।

বাড়ীতে রূপদাদার স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হল। ভাবিজী ও রূপদাদার স্ত্রী জানালেন যে দুই ভাইয়েরই আগস্ট মাসে জন্ম ও ডিসেম্বরে মৃত্যু। যতক্ষণ বাড়ীতে ছিলাম অজস্র লোকের যাওয়া আসা। ব্রিজমোহন শর্মা বারবার আসছেন তার নির্বাচনের কাজ ফেলেও। এক হাজারের ওপর গরীব দুঃখী মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন ধ্যানচাঁদের ছেলেরা। এছাড়া শ'পাঁচেক আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুরাও আছেনই। চিকিৎসার জন্য টাকা যারা সরাসরি দিয়েছেন তারা হলেন আগ্রার ধ্যানচাঁদ কমিটি, ইস্টার্ন রেল ও মোহনবাগান ক্লাব। একসময় ভাবিজী উঠে গিয়ে পঙ্কজ গুপ্তর একটি ছবি বের করে আমাকে বললেন, 'তোমার দাদাজীর হকি খেলার 'পিতাজী'। ফটোটি নমস্কার করে রেখে দিলেন।

মনে পড়ে গেল মাত্র এক বছর আগে 'দাদাজী'র সঙ্গে বসে গুপ্ত সাহেব ভারতের হকির জন্য কি করেছেন সে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি। কত গল্প শুনেছি তার কাছে। একবার 'দাদাজী'কে প্রশ্ন করেছিলাম যে ১৯৫৬ সালের পর ভারতের হকির এ হাল কেন? দেখলাম 'দাদাজী'র সারা শরীর রাগে কাঁপছে। চেঁচিয়ে সেদিন বলেছিলেন, 'আমরা মাকে বিদেশের মাটিতে টাকার লোভে বিক্রী করে এসেছি। ভারত সরকারের উচিত বিদেশে হকি কোচ পাঠানো বন্ধ করা। দেশের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য, ঝাণ্ডাকে উঁচু করে রাখার জন্য আমরা এক প্রাণ এক মন নিয়ে মাঠে খেলতে নামতাম। সোনা নিয়ে এসেছি মার জন্যে বারবার। আর এখন?' 'দাদাজী'র গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল আবেগে।

দাদাজী বললেন, তাদের সময় জাহাজে করে তারা খেলতে যেতেন। এক মাস লাগত। 'আমরা জাহাজের ডেকে প্র্যাকটিস করতাম। খেলা আর খাওয়া ছাড়া আর কি কাজ তখন?' তাকে প্রশ্ন করলাম আপনার নামের পাশে চাঁদ কেন? যেখানে অন্য সকলের পাশে শুধু সিং। হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন: 'এটাও তোমার বাংলা থেকে পাওয়া। গুপ্তাজী তার 'অ্যাডভান্স' কাগজে একদিন আমাকে পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে ধ্যানচাঁদ বললেন। সেই থেকে নামের সঙ্গে 'চাঁদ' জুড়ে গেল। এমনকি আমার কাজের জায়গা সামরিক দপ্তরেও ধ্যানচাঁদ চালু হয়ে গেল। আসলে আমার নাম ধ্যান সিং।'

আবার পুরনো কথায় ফিরে এলাম। প্রশ্ন করলাম, আপনি কি বিদেশে কোচ করার আমন্ত্রণ পেয়েছেন কখনও?' সোজা উত্তর, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু যাইনি। যাব না।' বললাম, 'অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।' এবার উত্তর আরও সুষ্ঠু। ধ্যানচাঁদ বললেন, 'আমি সোনা আনতে যেতাম। ভারতে আর সবই পাওয়া যায়।'

ছেলেদের খেলা শিখিয়েছেন কিনা এর জবাবে বললেন যে 'না। আমি ১৯২২ সাল থেকে দেশের সেবা করে এসেছি। বাড়িতে ২/১ মাসের জন্য যেতাম। আমি মনে করি ভারতের সব খেলোয়াড়ই আমার ভাই অথবা ছেলে। আলাদা করে নিজের ছেলেদের খেলা শেখাবো একথা কোনদিন মনে হয়নি।'

অশোককুমার ওলিম্পিক যাওয়ার আগে বাবার পাশে



হঠাৎ ভাবিণ য়েগে আলমারী খুলে একখানা খাতা বের করে দিলেন? 'এরমধ্যে আমার জীবনের সব কিছু জেনে যাও।'

বহু ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯৬৬ সালে পাতিয়ালায় আমি তখন একমাত্র বাঙালী ছাত্র; হকিতে এন আই এস কোচিং শিখতে গিয়েছি। একদিন হঠাৎ খবর এল ফ্র্যাঙ্ক ওরেল পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস দেখতে আসছেন। সঙ্গে আছেন রাজ্যপাল ধরমবীর। প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা এবং রাজা ভলীন্দর সিং। আমরা সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে আছি। একটা গাড়ী থেকে ওরেল সাহেব নেমে রাজা ভলীন্দর সিংকে কি যেন প্রশ্ন করলেন। রাজা ভলীন্দর সিং হাত দিয়ে কি দেখালেন। প্রায় ১০০ গজ দূর থেকে দৌড়তে শুরু করলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার অল রাউণ্ডার ফ্রাঙ্ক ওরেল। অবিস্মরণীয় এক দৃশ্য। থামলেন একেবারে ধ্যানচাঁদের পায়ের সামনে। প্রণাম করলেন। যেন অনেকদিন পরে আসল গুরুর দেখা পেয়ে জীবন সার্থক করলেন। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে ওরেল ধ্যানচাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। ভোলা যায় না সেই ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মুহূর্ত।

এরপর আরও একটি ঘটনা, যা কোনদিন ভুলতে পারব না। পাতিয়ালা কোয়ার্টারে দাদাজী, বালকৃষান সিং এবং আমি বসে কথা বলছি। একটা টেলিগ্রাম এল 'দাদাজী'র নামে। তখন বেলা এগারোটা। টেলিগ্রাম খুলেই 'দাদাজী' চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন: 'হাম কুত্তা হ্যায়, হাম কুত্তা হ্যায়। যে মা আমাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন তার শেষ সময় একটু জল খাওয়াতে পারলাম না। বালকিষেনকে বললেন যে শেষবারের মত মাকে দেখবেন। আমরা

ঝাঁসীর বাড়ীতে অশোককুমার, ধ্যানচাঁদ ও লেখক



তাড়াতাড়ি 'দাদাজী'র ঝাঁসী যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। 'দাদাজী' মাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

কে ডি সিংকে (বাবু) দাদাজী খুব ভালবাসতেন। বাবুর প্রথম প্রিয়পাত্র ঝমনলাল শর্মা আমাকে একদিন বলেছিলেন যে বাবু কোন লোককে প্রণাম করেন না। একমাত্র ব্যতিক্রম ধ্যানচাঁদ।

এ বছরেই 'দাদাজী' ট্রেনে করে লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন স্টেডিয়ামটি যাতে কে ডি সিং-এর (বাবুর) নামে নামকরণ করা হয়। প্রতিযোগিতার নামও বাবুর নামে করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও সম্মতি দিয়েছিলেন! সেদিন ছিল ২৩ জানুয়ারি। পাতিয়ালায় ধ্যানচাঁদের নামে একটি অতিথিশালা গত বছর খোলা হয়। নামকরণের সময় ধ্যানচাঁদ নিজেই উপস্থিত ছিলেন।

ধ্যানচাঁদের একটা অন্তর্দৃষ্টি ছিল। যে কোন লোক হকি স্টিক হাতে নিয়ে দু/একবার বল মারার পর বলে দিতেন যে ওর হকি খেলা হবে কিনা। আর যারা ভাল হকি খেলত তাদের ভুল অতি সহজেই সংশোধন করে দিতেন।

চিরকালের স্পষ্টবাদী মানুষ, আমার গুরুজী, আমার দাদাজী। কখনও ওলিম্পিক দলের ম্যানেজার অথবা কোচ হননি। উমেদারী করা পোষাত না তার। ১৯৬০ সালে ওকে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য করা হয়। নির্বাচন নিয়ে ওর সঙ্গে প্রায় প্রত্যেকের রাগারাগি হয়ে গেল। পরে ওরা আর দাদাজীকে খবর দিতেন না। অথচ ১৯৬০ সালে ভারত হারবে একথা ধ্যানচাঁদ আগেই বলেছিলেন।

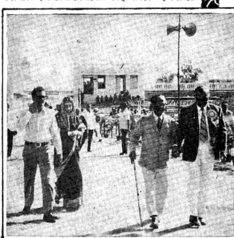
পাতিয়ালায় একদিন আমাদের নিশানা পরীক্ষা হল। দাদাজী বললেন এক গোলপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে অন্য গোলপোস্টের মধ্য দিয়ে বল পাঠাতে হবে। আমরা সবাই ব্যর্থ হলাম। 'দাদাজী' নিজের চোখ বেঁধে নিয়ে এক হিটে অন্য গোলে বল পাঠালেন।

শুধু হকি খেলা নয়। 'দাদাজী'র বন্দুকে ছিল অব্যর্থ নিশানা। উড়ন্ত পাখী বাজী ধরে মারতেন। মাছ ধরতেও সমান দক্ষতা। হকি ছাড়া শিকার ও মাছ ধরা ওর বিশেষ শখ। আমি, কে ডি সিং (বাবু) ও দাদাজী অনেকবার শিকার ও মাছ ধরতে গিয়েছি। 'বাবু' ধ্যানচাঁদের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের ২০০ টাকা মাসোহারা ব্যবস্থা করেছিলেন।

ধ্যানচাঁদের বাবার নাম শামশের সিং, মার নাম শ্যামা দেবী। স্ত্রীর নাম জানকী দেবী। দাদাজীরা তিন ভাই ছিলেন। বড় মূলচাঁদ ১৯৭৪ সালে মারা যান। দু'বছরের মধ্যে রূপ ও ধ্যান চলে গেলেন।

সাত ছেলে মোহনকুমার (কোটাতে হকি কোচ), সোহনকুমার, রাজকুমার, অশোককুমার, উপেন্দ্রকুমার, ভূপেন্দ্রকুমার ও বীরেন্দ্রকুমার। অশোককমার ভারতীয় ওলিম্পিক দলে ১৯৭২ ও ১৯৭৬ সালে খেলেছেন। রাজকুমার কলকাতায় মোহনবাগানে খেলেছেন অনেক দিন। বর্তমানে ইস্টার্ন রেলে রয়েছেন। সব ক'জনই হকি খেলেছেন অথবা খেলছেন। চার মেয়ে, তিনজনের বিয়ে হয়েছে। ছোট এম এ পড়ছেন।

আগামী ১৫ জানুয়ারী ইস্টার্ন রেল মাঠে ধ্যানচাঁদ হকি শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করতে আসছেন ধ্যানচাঁদের স্ত্রী জানকী দেবী, অশোককুমারও উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন। ১৩-১৫ বছরের ছেলেদের হকি খেলা শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে ওই শিবিরে।



১৯৭৫ সালে রেলে ফ্রাঙ্ক ট্রফির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এম এ এম রামস্বামী ধ্যানচাঁদের পাশে

কলকাতায় রেনে ফ্রাঙ্ক ট্রফির খেলা ভেস্তে গেল

বিশেষ প্রতিনিধিঃ শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত হকি ফেডারেশনের সভাপতি এম এ এম রামস্বামী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কবুল করলেন যে তারা কলকাতায় রেনে ফ্রাঙ্ক ট্রফির খেলা আগামী জানুয়ারীতে করতে পারছেন না। অনেকদিন পরে শুধু নয়, বলতে গেলে এই প্রথম কলকাতায় একটি প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

সংবাদটি প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মুখপাত্র জানান যে, শ্রীরামস্বামী কলকাতায় আগামী বছরের শেষে অথবা পরের বছর রেনে ফ্রাঙ্ক করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারী মুখপাত্রটি আরও জানিয়েছেন যে, এই সংবাদ হকি-প্রেমীদের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশার সৃষ্টি করবে।

কিন্তু পর্দার অন্তরালে কলকাতায় রেনে ফ্রাঙ্ক নিয়ে সারা ভারতব্যাপী যে জল ঘোলা হল তার তুলনা নেই। এই জল ঘোলা কেন হল এ বিষয়ে কেউ গবেষণা করলে ভারতের ক্রীড়াজগতে যে চিন্তার দৈন্য, ঈর্ষা, ষড়যন্ত্রের মনোভাব প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তার একটা হদিশ পেতে পারেন। এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার সম্পর্ক এখনো যথেষ্ট ঘোলাটে হয়ে রয়েছে যা ভারতের খেলাধূলায় উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়।

কলকাতায় রেনে ফ্রাঙ্ক ট্রফির জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের প্রস্তাবটি প্রথম আসে ফিল্ড মার্শাল মানেকশর মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী তার দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর যে অর্থ আগাম প্রয়োজন হবে তার অনুমোদন দেন। যথারীতি কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গড়া হয়। সেখানে প্রথমে রাজ্য সংস্থার কোন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয়নি। প্রথম দিকে রেনে ফ্রাঙ্কের প্রস্তুতি (কলকাতায়) সরকারী স্তরে হতে থাকে।

রাজ্য সংস্থার মহল থেকে এ বিষয়ে আপত্তি জানানো হয় নানা সূত্র মারফৎ। যদিও মুখ্য সচিব স্বয়ং রাজ্য সংস্থার সভাপতি। বিদেশ থেকে বিভিন্ন দলকে নিমন্ত্রণ করে আনার জন্য গুরুবক্স সিং (হকি খেলোয়াড়), বি কে সাহা (ডেপুটি কমিশনার, লালবাজার হেড কোয়ার্টার্স) এবং অশোক ভট্টাচার্য (ডেপুটি সেক্রেটারি, ক্রীড়া দপ্তর) ইউরোপ যান। সেখানে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সদর দপ্তরে (হেগ) গিয়ে কথাবার্তা বলে আসেন। এবং তারা কিছু প্রতিশ্রুতি পান বলেও দাবী করছেন! কলকাতায় নিখিল ভারত হকি ফেডারেশনের সহ-সম্পাদক দয়াকিষেণ এসে আরও কিছু অতিরিক্ত প্রতিশ্রুতি দেন। ফলশ্রুতি রাজ্য সংস্থার একজন প্রতিনিধিকে স্টিয়ারিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আসল গোলমাল থেকেই যায়।

পাকিস্তানে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য সুপার ওয়ার্লড কাপের প্রস্তুতি এগিয়ে গেলেও বিদেশী দলগুলি করাচী থেকে ভারতে আসবে কিনা এ সম্পর্কে নিখিল ভারত হকি ফেডারেশনের সদর দপ্তর কিছুই জানাতে পারেনি। ভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক দয়াকিষেণ হাসপাতালে যাওয়ার আগে শ্রীরামস্বামীকে জানিয়েছেন যে ভারতে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে কোন প্রথম শ্রেণীর বিদেশী দলগুলিকে আনা সম্ভব হচ্ছে না। অনেকেই এখন সন্দেহ করছেন যে সহকারী সম্পাদক আদৌ কোন চেষ্টা করেছিলেন কিনা।

দুঃখীরাম কোচিং স্কিমের চার বছর

স্টাফ রিপোর্টারঃ দুঃখীরাম মজুমদার কোচিং স্কিম এবার চার বছরে পা দিল। জন্মের পর থেকেই এই স্কিমে তৈরি হওয়া কচিকাচা ফুটবলাররা সকলের প্রশংসা আদায় করে চলেছে। বিশেষ করে চলতি মরশুমে স্কিমের ছেলেদের পারফরমেন্স খুবই আশাপ্রদ।

এই শিবিরের পাঁচ ক্ষুদে খেলোয়াড় এবছর রাজ্য দলের জামা গায়ে গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবলে খেলেছে। ৫ জনের মধ্যে দুজন জাতীয় সাব-জুনিয়র ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে। ১৯৭৬ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৫ জন বিভিন্ন বছরে খেলেছেন রাজ্য সাব-জুনিয়র দলে। বর্তমানে কলকাতার প্রথম থেকে চতুর্থ ডিভিসনের বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে লিগ ফুটবল ও অন্যান্য টুর্নামেন্টে খেলছেন এই স্কিমের ৭০ জন ছেলে। এছাড়া এবছর স্কিমের খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দুটি দল, বোলপুর টাউন ক্লাব চ্যালেঞ্জ শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সের ট্রফি নিয়ে এসেছে। গত বছরও দুঃখীরাম কোচিং স্কিমের ছেলেরা এই ট্রফি নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

গত বছরে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের সঙ্গে আগরতলায় হাজির ছিলেন এই সংস্থার দুজন শিক্ষার্থী।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যথাক্রমে তিনজন ও একজন খেলোয়াড়। গত বছর সাব-জুনিয়র বিভাগের দুই প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় স্কুল গেমস ও গ্রামীণ খেলাধূলাতে বাংলা ফুটবল দলের জামা পরেছেন।

এই মুহূর্তে ক্যাম্পে মন দিয়ে আধুনিক ফুটবলের প্রথা প্রকরণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন ৩৫০ জন ছেলে। এরা আণ্ডার সাব-জুনিয়র, সাব-জুনিয়র, মাঝারি ও সিনিয়র এই চারটি গ্রুপে ভাগ করে সপ্তাহে তিনদিন করে তালিম পান ভারপ্রাপ্ত কোচদের কাছ থেকে। প্র্যাকটিসের পর প্রত্যেককেই টিফিন দেওয়া হয়। ফুটবলের পাশাপাশি স্কিমের ছেলেরা এবছর রাজ্য হ্যাণ্ডবল লিগে অংশ নিয়েছেন।

টেস্ট-টিম

প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



জাগিলে 'চেতন' মিলিবে বেতন
শক্ত রানের ভিতে—
ভরে ওঠে বুক নাহি কোনো দুখ
ম্যাচটি লইব জিতে !!
ক্ষতি নেই ভাই যদি নাহি পাই
'সুনীলের' শতরান—
ভগ্নীর পতি রাখিবে যে গতি
'বিশ্বনাথই' দেবে রান !!
বয়সে নবীন সামনে সুদিন
'ভেঙ্গসরকর' তোলে রান—
তবু 'যশপাল' ধরে যেই হাল
সুমহান অবদান !!
আজ 'কিরমানী' খুব বড় জানি
সন্দেহ নেই তায়—
চেয়ে দেখি তারে আজ বারে বারে
চক্ষু জুড়ায়ে যায় !!
'রজার বিনী' সুখ-জাল বুনি
এল বুঝি আজ টিমে
'কপিলের' বল করে রসাতল
রান ওঠে তাই টিমে !!
কপিলের পাশে 'ঘাউড়িই' আসে,
বয়স নয়কো বেশী—
'শিবলাল' তার স্পিন মজাদার
হ্যাভক করল 'দেশি' !!

বিদ্রোহী ক্রিকেটার পুঁটু চৌধুরী ও তার অপ্রকাশিত একটি বিতর্কিত রচনা

বিশেষ প্রতিনিধি

মনে হচ্ছে মাত্র সেদিনের কথা। বিহার জামশেদপুর থেকে বাংলার সঙ্গে রঞ্জি ট্রফি খেলতে এসেছে কলকাতায়। ইডেন গার্ডেনে খেলা। বিহারের অধিনায়ক শরদিন্দু ব্যানার্জি (সুঁটে) নাকি নতুন এক ফাস্ট বোলার নিয়ে এসেছেন। নাম পুঁটু চৌধুরী (নীরদ)। সুঁটে ব্যানার্জির চেয়ে জোরে বল করেন। তার ওপর 'কাটার'। বিদ্যুত বেগে বল অফ স্টাম্পের লাইনে অথবা বাইরে পড়ে ভেতরে চলে আসে। বলের লাইনে পা না থাকলে ব্যাটসম্যানের উইকেট ছিটকে পড়ে। আবার মাঝে মাঝে লেন্‌থের ওপর পড়ে বল লাফিয়ে উঠে ব্যাটসম্যানের মাথা আর বুক লক্ষ্য করে চলে আসে। স্লিপে হামেশাই ক্যাচ ওঠে। ফিল্ডারদের সব নাম জপ করতে হয় যাতে পুঁটু চৌধুরীর বলে ব্যাটসম্যানেরা খোঁচা না মারেন। ব্যাটসম্যানদেরও 'ত্রাহি-মধুসূদন'। এমনই বোলার ছিলেন পুঁটু চৌধুরী।

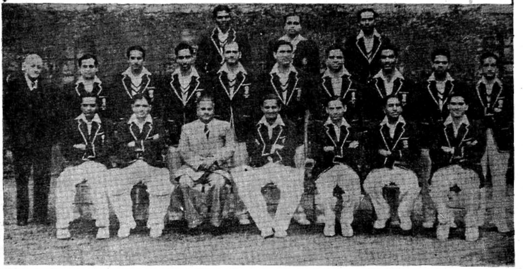
ইডেনে খেলা শুরু হল। বাংলা ব্যাট করছে, একদিক থেকে সুঁটে ব্যানার্জি আর অন্যদিক থেকে পুঁটু চৌধুরী। তিন ওভারের মধ্যে দুটো উইকেট পড়ে গেল। তখনকার ইডেন গার্ডেনের ছোট ছোট নড়বড়ে গ্যালারিতে আর্তনাদের সুর। বাংলা কোণঠাসা অবস্থায়। কোলাপস্ করেনি। নির্মল চ্যাটার্জি সে ম্যাচে সেঞ্চুরি করলেন তবে অনেকবার রেহাই পেয়ে। সঙ্গী হার্ভে জনস্টন অবশ্য ৮২ রানের এক অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন সেদিন। যতক্ষণ খেলেছিলেন একবারও আউট হওয়ার সুযোগ দেননি। সুঁটে ও পুঁটু একবারও তার পায়ে বল লাগাতে পারেননি পর্যন্ত। আম্পায়ার ছিলেন কনক চ্যাটার্জি, হার্ভে তাকে ওই ব্যাপারে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। তবে ওই ম্যাচে অনেক কাণ্ডের মধ্যে সুঁটে ব্যানার্জি রাগ করে পিচের ওপর অল-ইণ্ডিয়া ক্যাপ আছড়ে ফেলেছিলেন একবার। প্রতিবাদ অবশ্যই বাংলার আম্পায়ারদের বিপক্ষে। পরের বছর থেকেই ক্রিকেট বোর্ড নিরপেক্ষ আম্পায়ার নিয়োগ করার প্রথা চালু করলেন।

পুঁটু চৌধুরী অবশ্য ১৯৪৩-এর পর আর বিহারে খেললেন না। স্যার জে সি মুখার্জির চেষ্টায় বাংলার হয়ে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন। বিহারে ১৯৪১-৪৩ এবং বাংলায় একটানা ১৯৪৪-৫৪ রঞ্জি ট্রফি খেলেছিলেন। পুঁটু শেষ পর্যন্ত বাংলারই হয়ে যান। তবে বিহারে থাকতে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। ইন সাইডে ভাল খেলতেন।

দীর্ঘ ১৪ বছরে রঞ্জি ট্রফিতে ১০৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। আজকের দিনে সংখ্যাটা খুব একটা বেশি নয়, যদি আমরা বছরের কথা মনে রাখি। কিন্তু ভুললে চলবে না পুঁটু চৌধুরীরা যখন খেলেছেন তখন রঞ্জি ট্রফি নক আউট প্রথায় খেলা হত। বিহার আগাগোড়া, বছরে একটি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত এবং বাংলা (অধিকাংশ সাহেব নিয়ে) দুটি অথবা বড়জোর তিনটি। এখন বাংলা ও বিহার প্রতি বছরই রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালে যাচ্ছে। অর্থাৎ কমপক্ষে চারটি ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকছেই।

গডার্ডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (১৯৪৮-৪৯) এবং নিগেল হাওয়ার্ডের ইংল্যাণ্ড দলের বিপক্ষে ভারতের মাটিতে দুটি টেস্ট খেলা ছাড়াও বেসরকারী পাঁচটি টেস্ট খেলেছেন। ১৯৫২ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় দলের সদস্য হলেও কোন টেস্ট ম্যাচেই খেলার সুযোগ পাননি। ওই সফরে অন্য দুই বাংলার খেলোয়াড় হলেন পঙ্কজ রায় এবং প্রবীর

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল—১৯৫২ : বসে : এস জি সিন্ধে, ভিন্নু মাঁকড়, পি গুপ্ত (ম্যানেজার) ডি এস হাজারে (অধিনায়ক), এইচ আর অধিকারী (সহঃ অধিনায়ক), সি টি সারভাতে এবং ডি ফাদকার, দাঁড়িয়ে-ডবলিউ ফার্গুসেন (স্কোরার), পঙ্কজ রায়, পুঁটু চৌধুরী, সি ডি গোপীনাথ, গুলাম আমেদ, উমরিগড়, আর ডি ডিস্তেচা, জি এস রামচাঁদ, বিজয় মঞ্জরেকর, ডি কে গায়কোয়াড়, পিছনে : এইচ জি গায়কোয়াড়, পি সেন ও এম কে মন্ত্রী।



পুঁটু চৌধুরীর রচনা

আমরা যখন খেলেছি নিঃসন্দেহে তখন বাংলার ক্রিকেটের মান অনেক উঁচুতে ছিল। লিগ ও নক আউট ছিল না। সারা সিজন ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ হত। কিন্তু তাতে ক্রিকেট ছিল। প্রায় প্রতিটি ক্লাবেই দু/চার জন করে এমন সব ক্রিকেটার ছিলেন যারা বাংলা দলে খেলার উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাদের চেয়ে ভাল এগারোজন নিয়ে দল গড়া হত বলে তারা স্থান পেতেন না। আজকের যা বাংলার মান তাতে সেই বাদ যাওয়া খেলোয়াড়রা রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে পারতেন। এছাড়া মরশুমের আগে অনেক ক্লাব ও সি এ বি-র নির্বাচিত দল অন্যান্য প্রদেশ সফর করত। মরশুমের আগে ফিরে এসে ফ্রেণ্ডলি খেলা শুরু হত। ভাল ভাল সব খেলা, দেড়দিনের মেয়াদ ছিল। নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলত।

তখন প্রতিটি ভাল দলের দুটি করে দল থাকত। একটি সিনিয়র ও অপরটি জুনিয়র। জুনিয়র টিমে যারা ভাল খেলত তাদের সিনিয়র দলে দেওয়া হত। জুনিয়র ছেলেরা চেষ্টা করত কিভাবে ভাল খেলে সিনিয়রদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাবে। ভাল ভাল খেলোয়াড়দের নিয়ে ট্রায়াল হওয়ার পর প্রাক্তন খেলোয়াড়রা রঞ্জি ট্রফি দল তৈরি করতেন। তবে সিলেকশন কমিটিতে চিরকালই একজন অ-খেলোয়াড় থাকতেন। তিনি অল-ইণ্ডিয়া সিলেকশন কমিটিতেও যুক্ত ছিলেন অনেক দিন।

আমাদের সময় ভারতের অনেক দিকপাল খেলোয়াড় কলকাতায় খেলতে আসতেন। যেমন পি ই পালিয়া, ভিনু মাঁকড়, সি এস নাইডু, মস্তেরেকার, ফারকার প্রমুখ। এরা খেলায় বাংলার ক্রিকেটের মান বেড়েছিল।

একটা কথা জেনে রাখা উচিত, সকলের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের যখন প্রবর্তন করা হয় তখন ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব (এখনকার সি সি এফ সি)। যারা এদেশে ক্রিকেট চালু করে। ক্যালকাটা আজ লিগ অথবা নক আউটে অংশগ্রহণ করে না। ক্রমশ দেখা গেল প্রতিযোগিতামূলক খেলা প্রবর্তন করার ফলে ক্লাবের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখন এ সংখ্যা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে তা ধারণার বাইরে। এতে খেলার উন্নতি হওয়ার চেয়ে গ্যাঞ্জাম বেশি হয়। এই বছর বছর ক্লাবের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ানো নয়—টেস্ট টিকিটের সংখ্যা বাড়ানো। এখন এমন সব কর্মকর্তা আছেন যারা একাধিক ক্লাবের সঙ্গে জড়িত এবং তাদের এইসব ক্লাব মোটা টিকিটের কোটা পান।

আমার মতে ক্লাবের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে। হয়ত বলবেন কি করে তা সম্ভব? সোজা উপায় যে যে ক্লাব স্ট্যাণ্ডার্ড ক্রিকেট খেলতে পারবে না তাদের অ্যাসোসিয়েশন বাতিল হয়ে যাবে। সেইভাবে আইন করতে হবে। এবং আইন থাকবে কোন কর্মকর্তা একাধিক ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। এই ক্লাব-সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অখেলোয়াড়রাও খেলার সুযোগ পাচ্ছে। কারণ ক্লাবদের যেভাবেই হোক টিম করতে হবে। এবং সব চেয়ে মজার ব্যাপার এই সব খেলোয়াড়রা খেলার বিনিময়ে টাকা পাচ্ছেন। এই সব উঠতি ক্লাব ও কর্মকর্তারা খেলাধূলার সঙ্গে তেমন পরিচিত নন এবং তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে অখেলোয়াড়রা খেলার সুযোগ করে নিচ্ছেন…।

……এখনও সময় আছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের মান তুলতে আবার পুরনো দিনে ফিরে যেতে হবে। যতই কোচিং প্রোগ্রাম হোক কিছুই হবে না। এসব হচ্ছে ভস্মে ঘি ঢালা। কোচদের মিশনারি হতে হবে, পয়সার ধান্দা করলে চলবে না। এই যে সি এ বি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছে তাতে কি ফল হয়েছে। আজ অবধি একটা বাঙালী ছেলে ভারতের পক্ষে খেলার মত হয়েছে? ছোট ছোট ছেলেদের মাঠ থেকে বেছে নিয়ে তৈরি করে নিতে হবে—সেখানে কোনরকম দুর্নীতি অথবা পক্ষপাতিত্ব দেখালে চলবে না দেশের স্বার্থে। কিন্তু কথা হচ্ছে ট্যালেণ্ট বাছবে কারা? এভারটান উইকস একদিন ক্লাইভ স্মিথকে ব্যাট করতে দেখে নিয়ে এসেছিলেন। স্মিথ একদিন বড় ব্যাটসম্যান হয়েছিলেন। বাংলাদেশে একদিন দুঃখীরামবাবু, ছোনে মজুমদার, সুঁটে ব্যানার্জিরা মাটি থেকে তুলে এনে খেলোয়াড় তৈরি করেছিলেন।

……কভার্ড পিচ চাই বেশ কয়েকটা যাতে সমস্ত ক্লাব পিচ ভাড়া করে নিজেদের খেলোয়াড়দের অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে পারে। যেমন আলফ গোভার স্কুলে আছে। অধিকাংশ ক্লাব ভাড়া নিয়ে নিজেদের প্লেয়ারদের নেট প্র্যাকটিসের সুযোগ করে দেন।

আমাদের ক্রিকেট সংস্থার যিনি নতুন সেক্রেটারি হয়ে এসেছেন তার সুনাম নিশ্চয়ই রাখবেন আশা করি। এবং এই সংস্থাকে নতুন রূপ দেবেন যাতে বাংলার ক্রিকেটের মান উন্নত হয়।

১৪.৭.৭৮

সেন।

সেই গরীব ক্রিকেটের যুগে সাধারণ বিত্তের ঘরের ছেলেরা ভাল ক্রিকেট খেললেও বোধহয় কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রভেদে চিরকালই অপাংক্তেয় থেকেছেন এবং কষ্ট পেয়েছেন। যেমন পুঁটু চৌধুরী। এ দৃষ্টান্ত অগণিত। অনেকেই বাংলা থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে যাওয়ার সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারেননি। অথচ ভাল খেলার জন্য কি দারুণ সাধনা করে গিয়েছেন তারা।

নিজের বলের মত পুঁটু চৌধুরী যেন চিরকালই দুর্বিনীত বিদ্রোহী খেলোয়াড়। স্পষ্ট কথার মানুষ। ফলে ওপর মহলে অনেকেই হয়ত তাকে সেরকম সুনজরে দেখতেন না। আর সত্যি কথা বলতে গেলে পুঁটু চৌধুরী নিজেই কি নিজের প্রতি সারাজীবন সুবিচার করেছেন?

বোর্ড তার জন্য বেনিফিট ম্যাচের অনুমতি দিলেও সি এ বি শেষ পর্যন্ত আর করতে পারলেন না। হয়ত এখনকার কর্মকর্তাদের মনে সেটা ছিল। সময় অভাবে আর হল না।

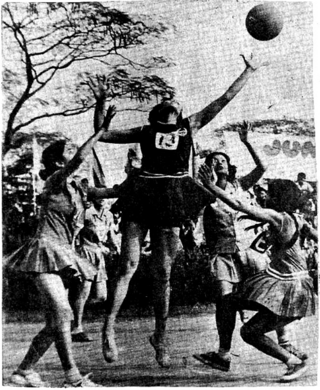
দেরী আমরাও করেছি। পুঁটু চৌধুরী বাংলার ক্রিকেটের মানের ক্রমাবনতি দেখে খুব কষ্ট পেতেন। তাই বছর খানেক আগে আমাদের দপ্তরে একটি লেখা পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে নানা অনিবার্য কারণে আমাদের পক্ষে এতদিন তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বাংলার ক্রিকেট নিয়ে লিখিতভাবে এরকম সুষ্ঠু মতামত আর কেউ করেনি।

পুঁটু চৌধুরীর বল যেমন ব্যাটসম্যানদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত, ফিল্ডাররাও কুঁকড়ে থাকতেন কখন ক্যাচ চলে আসবে হাতের নাগালের মধ্যে, এই লেখাও হয়ত স্বার্থান্বেষী মহলে তেমনি কিছু অশান্তির সৃষ্টি করতে

পরলোকে অনিল কুমার রায়

সম্প্রতি মালদা জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী ও সংগঠক অনিল কুমার রায় (৬৯) হৃদরোগে পরলোক গমন করেছেন। খেলাধূলাকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার কথা সামনে রেখে গড়ে ওঠা পশ্চিমবাংলা জেলা স্পোর্টস ফেডারেশনের অন্যতম হোতা ছিলেন শ্রীরায়। জেলা স্পোর্টস ফেডারেশনের সভাপতি বা কখনও কার্যকরী সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে মালদা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়েছেন। বহুদিন তিনি সি এ বি ও আই এফ এ-র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। মালদা জেলায় খেলাধূলার প্রসারে বিরাট অবদানের জন্য জেলার সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন শ্রীরায়। এছাড়া স্থানীয় লায়ন্স ক্লাব, সেণ্ট জনস্ অ্যাম্বুলেন্স, রাইফেল ক্লাব এবং মালদা ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গেও শ্রীরায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্থানীয় বহু সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীরায়ের প্রতি সম্মান দেখানো হয়।

রাজ্য বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন সুফি ও বয়েজ ট্রেনিং



বাস্কেটবলের আসরে লরেটো ও সুফির মেয়েরা / শংকর নাগ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় তাদের মাঠে প্রথম রাজ্য বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। শুরু হয়েছিল ৯ ডিসেম্বর শেষ হল মহিলা ও পুরুষদের চূড়ান্ত খেলা দুটি দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর। পুরুষদের মোট ১৬টি দল অংশ নিয়েছিল যার মধ্যে চারটি ছিল জেলা দল। হুগলী, বীরভূম ও জলপাইগুড়ি জেলা কলকাতার দলগুলির সঙ্গে ঠিক মতো পাল্লা দিতে পারেনি, কিন্তু বর্ধমান জেলা বুঝিয়ে দিল আগামী বছর তারা কলকাতাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মহিলাদের ৮টি দলের মধ্যে দুটি দল ছিল বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি। নক আউট কাম লিগ প্রথায় খেলাগুলি পরিচালিত হয়েছিল। উদ্বোধন করেছিলেন সংস্থার সভাপতি বি কে সাহা। পুরুষ বিভাগের নক আউটের খেলায় 'এ গ্রুপে বি টি এ এ' ছাত্র সমিতিকে ৯৭-৫৬ পয়েন্টে পরাজিত করে। রাখী সংঘ বি গ্রুপে বীরভূমকে ১০৩-৩০ পয়েন্টে পরাজিত করে ওয়াই এম সি-এর কাছে ৬৩-৬১ পয়েন্টে পরাজিত হয়। বড়বাজার তাদের প্রথম খেলায় জলপাইগুড়িকে ১৪৫-১৮ পয়েন্টে এবং 'বি টি এ 'বি'-কে পরাজিত করে 'সি' গ্রুপের শীর্ষে আসে। বর্ধমান মর্নিং স্টারকে ৮৮-৬০ পয়েন্টে, পুলিশকে ৬৪-৫৯ পয়েন্টে, এয়ার ফোর্সকে ৮৮-৪০ পয়েন্টে পরাজিত করে 'ডি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। সুতরাং পুরুষ বিভাগে 'ক' 'খ' 'গ' ও 'ঘ' বিভাগ থেকে বি টি এ 'এ', ওয়াই এম সি এ, বড়বাজার যুবক সভা ও বর্ধমান জেলা লিগ খেলার যোগ্যতা লাভ করে। আর মহিলাদের লরেটো, রেঞ্জার্স, পার্সি ও সুফি লিগ খেলার যোগ্যতা লাভ পায়। লরেটো ও সুফি লিগ খেলায় পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করে অপরাজিত অবস্থায় ফাইনালে মুখোমুখি হয়। বাস্কেট ও পাল্টা বাস্কেটের মধ্যে দিয়ে। ফাইনাল খেলাটি খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। সুফি লরেটোকে ৬৩-৫৭ পয়েন্টে পরাজিত করে মহিলাদের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হলেন। এই কৃতিত্বের মূলে সুফির জেনিফা পেস্-এর অবদান ছিল অনেকখানি। পুরুষদের লিগ খেলায় বি টি এ 'এ' ও বড়বাজার দল অপরাজিত অবস্থায় চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। দুতলয়ে বাস্কেট খেলার দক্ষতা দেখালেন দুই দলের খেলোয়াড়রা; বয়েজ ট্রেনিং জিতলো এই খেলায় ৯০-৮৬ পয়েন্টে। খেলার শেষদিকে বড়বাজার সর্বশক্তি নিয়ে পরাজয় এড়াবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি প্রধানত কার্তিক সাধুখাঁর কৃতিত্বের জন্য। সুফি ও বয়েজ ট্রেনিং-এর অধিনায়িকা ও অধিনায়কের হাতে ট্রফি দুটি তুলে দিলেন অশোক ভট্টাচার্য।



বাস্কেটবলে ওয়াই এম সি এ ও বি টি এ-র ছেলেরা / শংকর নাগ দাস



টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম একশো বছরে মাত্র সতেরোজন অলরাউণ্ডারের কে সেরা (১১)



দিলীপ সরকার : ইংল্যাণ্ডের কাছে সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা সকলেই মানসিক অস্থিরতায় ভুগেছিলেন। মাত্র দু' মাসের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ানরা আবার টেস্ট খেলতে ছুটলেন। স্টলমেয়ার, উইকস, ওরেল, ওয়ালকট, কলি স্মিথ এবং জে কে হলটারের মত জ'দরেল ক্রিকেটার নিয়ে বিশাল ব্যাটিং শক্তিতে টগবগে ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। নানারকম বোলিংও ছিল তাদের দলে।

এই সিরিজটাই মিলার ব্যাটিং ও বোলিং-এ যুগপৎ সাফল্য পেলেন চমৎকার। প্রথম টেস্টে ১৪৭ রান ও পাঁচ উইকেট, ১৩৭ রান ও তিন উইকেট চতুর্থ টেস্টে এবং ১০৯ রান ও আট উইকেট পান শেষ টেস্টে। সিরিজ শেষে ব্যাটিং গড় ছিল মিলারের ৭৩।

পুরো সিরিজটাই ছিল ব্যাটসম্যানদের। রেকর্ড বইয়ের পাতায় ২১টি সেঞ্চুরি জায়গা পেয়েছিল যা খুব একটা ঘটে না। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ওয়ালকট সুবিধে করতে পারেননি বলেই এবারে তার বদলা নিলেন। একাই টেস্টে তিনি এবার নিয়ে দু'ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন দুবার। পাঁচটা সেঞ্চুরি সহ সিরিজ শেষে ওয়ালকটের মোট সংগৃহীত রান হয়েছিল ৮২৭; কিথ মিলার ও হার্ভে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তিনটি করে সেঞ্চুরি হাঁকান। চতুর্থ টেস্টে ক্রিকেট ইতিহাসে পার্টনারশিপের একটি মহৎ নজির ঘটলো। সপ্তম উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ডেনিস এ্যাটকিনসন ও সি সি ডেপিজা সঙ্কটের সময়েও ৩৪৮ রান করে হৈ চৈ-এর কারণ ঘটালেন।

১৯৫১-৫২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরাজয়ে যেসব যুদ্ধোত্তর মহান ক্রিকেটার ছিলেন, যেমন কিথ মিলার, রয় লিণ্ডওয়াল, হার্ভে, মরিস ও জনস্টন এবং নতুন ক্যাপ্টেন ইয়ান জনসন এবারেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ছিলেন। তারা সব প্রথম টেস্টে ৫০০ রান অতিক্রম করলেন, দ্বিতীয় টেস্টে পৌঁছলেন ৬০০ রানে। চতুর্থতেও তাই এবং পঞ্চম টেস্টে করে বসলেন আট উইকেটে ৭৫৮ রান—এই সবই অস্ট্রেলিয়ানদের পক্ষে এখনো সেরা রান সংগ্রহের রেকর্ড। এর আগে এবং আজ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দর্শকরা এমন রানের গতি প্রত্যক্ষ করেননি।

সাবিনা পার্কের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের প্রথম দিনেই দু'উইকেটে ২৬৬ রান তুলে গোটা সিরিজটাতেই লম্বা রান সংগ্রহের আঁচ দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ানরা। ম্যাকডোনাল্ড ও মরিস ভিত গড়লেও কিথ মিলার এবং হার্ভেই বিরাট অঙ্কের রান তুলতে অস্ট্রেলিয়াকে সাহায্য করলেন। তৃতীয় উইকেটে তাদের সংগ্রহ হয়েছিল ২২৪ রান। হার্ভে ১৩৩ এবং মিলার ১৪৭ রান করেছিলেন এবং দুজনেই শিকার হয়েছিলেন ওয়ালকটের স্লো-মিডিয়াম অফ কাটারে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৯ জন বোলারকে এই ইনিংসে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ৫১৫ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়।

লিণ্ডওয়াল ও কিথ মিলারের ফাস্ট বলের মুখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা দাঁড়াতে পারলেন না। কেবল প্রথম ইনিংসে ওয়ালকট ১০৮ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করলেন ওনিল গর্ডন স্মিথ (১০৪)।

এই টেস্টে কিথ মিলার পাঁচটা, লিণ্ডওয়াল ৬টা এবং আর্চার চারটি উইকেট পেয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৫৯ ও ১৭৫ করলে অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয় পায়।

পোর্ট অব স্পেনের কুইনস পার্ক ওভালের দ্বিতীয় টেস্টটিতে কোন ফল হয়নি ম্যাটিং উইকেটে ব্যাটসম্যানদের বরাবর আধিপত্য থাকায়। প্রথম দিন বৃষ্টিতে তিন ঘন্টা খেলা হতে না পারায় এই ড্র টেস্টে দু'পক্ষের মোট রান হয়েছিল ১২৫৫ এবং উইকেট পড়েছিল ২১টি মাত্র।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়ালকট ও উইকস ব্যাটিং-এ বিরাটত্ব দেখালেন। ওয়ালকট দুই ইনিংসেই দুটি শতরান (১২৬ এবং ১১০) করলেন এবং উইকস এই লক্ষ্যে পৌঁছতে ১৩ রান মাত্র দূরে ছিলেন যখন শেষদিনে স্টাম্প উপড়ে ফেলা হল। তিন অস্ট্রেলিয়ান ম্যাকডোনাল্ড (১১০), মরিস (১১১) ও হার্ভের (১৩৩) সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৬০০ রান তুলে ফেলেছিল। ২১৮ রানে পিছিয়ে থেকেও এমন সুবিধেজনক পিচ পেয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানরা শেষ সময় পর্যন্ত চুটিয়ে ব্যাট করতে ভুল করেননি (৪ উইকেটে ২৭৩ রান)।

গোটা সিরিজে বড় বড় রানের ইনিংসের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জর্জ টাউনের তৃতীয় টেস্ট।

টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র ৮৬ রানের মধ্যে তাদের পাঁচজন ব্যাটসম্যান হারালো লাঞ্চের আগেই। এই পাঁচজনের মধ্যে কিথ মিলার ফিরিয়েছেন দু'জনকে। উইকস কারুর দ্বারা কোন সমর্থন না পেয়েও ৮১ রান করলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৮২ রানে। ম্যাচ হারবার রাস্তা পরিষ্কার হলো। কিথ মিলারের চমৎকার বোলিং এবং রিচি বেনোর (১৫ রানে ৪ উইকেট) লেগ স্পিনের শিকার হয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানরা।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে মিলার রান করেন ৩৩; মাত্র ৭৫ বেশি থেকে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান জনসনের অফ স্পিন (৪৪ রানে সাত উইকেট) ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ফের আঘাত করলো। দ্বিতীয় ইনিংসে রান হয়েছিল মাত্র ২০৭, মিলার এই ইনিংসে সাফল্য পাননি। মাত্র একটা উইকেট পেয়েছিলেন। দুটো উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রয়োজনীয় ১৩৩ রান তুলে ফেললো। আট উইকেটে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ২—০ এগিয়ে রইলো।

এই সিরিজে কিথ মিলারের আরেক স্মরণীয় ব্যাটিং ছিল কেনসিংটন ওভালের চতুর্থ টেস্টে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৬৬৮-র মধ্যে কিথ মিলারের অবদান ১৩৭ রান। মিলার ও আর্চার (৯৮) ষষ্ঠ উইকেটে ২০৬ রান যোগ করে সিরিজে রেকর্ড করলেন। মিলার সহ অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য ব্যাটসম্যানদের ঝাঁঝালো ব্যাটিং রুখতে ২০৬ ওভার বল করেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলারেরা সাফল্য পেলেন না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রান তোলে ৫১০, তাদের অধিনায়ক এ্যাটকিনসন (২১৯) ও ডেপিজার-এর (১২২) সপ্তম উইকেটে ৩৪৮ রান যোগের ফলে বিশ্ব রেকর্ড হয়ে যায়। এর আগে মিলারের দু'উইকেট নেওয়া সহ ছটা উইকেট পড়েছিল মাত্র ১৪৬ রানের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৪৯ রানে শেষ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছ'উইকেটে ২৩৪ রান তুললে ম্যাচ ড্র হয়ে যায়।

প্রথম টেস্টে যেমন ফল হয়েছিল তেমনি শেষ টেস্টেও তাই হয়ে সিরিজ শেষ হল। সাবিনা পার্কের এই টেস্টে, অস্ট্রেলিয়া তাদের সর্বোচ্চ রানে ইনিংস গড়লো, পাঁচটা সেঞ্চুরির করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ানরা। হার্ভে ডাবল সেঞ্চুরি করেন (২০৪)। তারপর মিলার (১০৯) ও আর্চার (১২৮) সেঞ্চুরি করেন। ছ'উইকেটে ৫৯৭ রানে রিচি বেনো ব্যাট করতে এলেন। তার শতরানের (১২১) সময় ছিল মাত্র ৭৮ মিনিট এবং তাতে যোগ হয়েছিল দুটি ছক্কা ও পনেরোটা চার। অস্ট্রেলিয়া আট উইকেটে ৭৫৮ করে ইনিংস ঘোষণা করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস আগে শেষ হয়েছিল ৩৫৭ রানে। ধ্বংস কাজে মত্ত ছিলেন কিথ মিলার আবার ছ'উইকেট তিনি শিকার করেন ১০৭ রানে। ওয়ালকটই একমাত্র ব্যাটসম্যান ছিলেন যিনি ক্যারিবিয়ানদের ব্যাটিং ঐতিহ্যের নমুনা কিছুটা দিতে পেরেছিলেন ১৫৫ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তোলে ৩১৯ রান। ওয়ালকট সেঞ্চুরি হাঁকান (১১০)। একাই রাবার সিরিজে দুবার দু'ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন প্রথমবার। অস্ট্রেলিয়ার জয় ইনিংস ও ৮২ রানে। এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দাপিয়ে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে। জয় ৩—০।

অল-রাউণ্ডার কিথ মিলারের সংগ্রহ ৪২৯ রান এবং কুড়িটি উইকেট।

(চলবে)



খোকা বড় হয়ে নির্ঘাত কপিলদেব হবে। দেখছ না ছক্কা হাঁকিয়ে শার্সিগুলোর কি হাল করেছে।

কার্টুন : পি জি



পরিবর্তন

১ জানুয়ারি সংখ্যার
বিশেষ আকর্ষণ

● আটাত্তরের সেপটেমবর। শাহ-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল তেহেরান। আগুন, গোলাগুলি, সংঘর্ষ। তেহেরানের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ঘটনা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন একজন বাঙালী ডাক্তার। নিজেও বিপদে পড়েছিলেন। অগ্নিঝরা দিনগুলির টাটকা কাহিনী। আধুনিক ইরানের ইতিকথা। শাহের গুপ্ত বাহিনী। লুকানো নগরী কোমায়েটে সারি সারি কঙ্কাল....

● একদিকে কয়লার চরম সংকট, দাম বাড়ছে হু হু করে—অন্যদিকে খনি এলাকায় চরম দুর্নীতি, পুকুর চুরি, পার্টিবাজি। কয়লা শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে কার লাভ হয়েছে? কেন দৈনিক কোটি টাকা লোকসান যায়? তা বন্ধ করার পথ কী? কয়লার সংকট কি মানুষের হাতে গড়া?

● অধ্যাপক থেকে স্বৈরিণী, অধ্যাত্ম-মার্গী থেকে চোরাকারবারী—সবাই ভিড় করে জ্যোতিষীর কাছে। কে কী জিজ্ঞাসা করে? কেমন করে মানুষ জ্যোতিষীর কাছে গোপন কথাটি ফাঁস করে দেয়?

● পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে? জ্যোতিষী কী বলছেন? ● ভারত-তিব্বত সীমান্তে কয়েক ঘণ্টা।

● যৌন রোগ কেন হয়? প্রতিকার কী? ● চিড়িয়াখানার আকর্ষণ কমছে কেন? ● কে বড়—গাভাসকর, না বিশ্বনাথ? দুর্লভ ফটো।

● নানান দেশের জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন কাজে কলকাতায় আসেন। তাদের সম্পর্কে নিয়মিত কলম—কলকাতার অতিথি। ● নতুন ফিচার—পথ চলতি।

পরিবর্তন
একক, অনন্য, অতুলনীয়

ইত্যাদি প্রকাশনী
৪৭, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭২
ফোন : ২৭৩৩১৬, ২৭২১৬৯

হিমানীশ গোস্বামী ঃ কোনো রান্নাই যেমন নুন ছাড়া হয় না, তেমনি পৃথিবীর কোনো কর্মই টাকা ছাড়া হয় না। কেউ শিল্পী এবং গায়ক হয়ে পড়লে টাকার মুখ তিনি দেখতে পান হয়ত, বড় শিল্পী এবং গায়ক হলে আরও বেশি টাকা তাদের করায়ত্ত হয়, এটাও ঠিক কিন্তু যে সময়টা গড়ে ওঠার সময় সে সময়টাও সেই হবু শিল্পী এবং গায়ককে বেঁচে থাকতেই হয়। সেই সময়টা তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেই হয়। হয় বাড়ির অভিভাবক, নয়তো বন্ধু-বান্ধব, নয়তো রাষ্ট্র। কিন্তু কে বড় গায়ক হবেন বা শিল্পী হবেন তা তো আগে থেকে জানা যায় না, তাই রাষ্ট্র এ ব্যাপারে প্রায় সমস্ত দেশেই নীরব এবং নিস্পৃহ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। দাবা খেলোয়াড় সম্পর্কেও ওই একই কথা। যে সাত বছরের ছেলে আজ দাবা খেলায় আগ্রহ দেখাচ্ছে, তাকে টাকা দিয়ে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা অনেক দেশেই যেমন নেই, আমাদের দেশেও তেমন নেই। তা ছাড়া জনসাধারণের শতকরা নিরানব্বুই ভাগই দাবা খেলা সম্পর্কে তেমন আগ্রহী নন। কে ভাল খেলছেন কে খারাপ খেলছেন তাই তারা জানতে পারেন না। অথচ আমাদের এই বাংলাদেশের কয়েক কোটি মানুষের মধ্যে কুড়ি জনও কি ছেলে বা মেয়ে নেই যারা দাবায় এখন আগ্রহী এবং চমৎকার খেলতে পারে? আমার ধারণা, নিশ্চয়ই রয়েছে— কিন্তু তাদের খুঁজে বার করাটা প্রথম দরকার।

এমনিতে হবে না। স্কুলের মধ্যে দাবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলে প্রতি স্কুলের সেরা দুজনকে নিয়ে স্কুলের মধ্যে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গে ১৫টা জেলা রয়েছে, প্রতি জেলা থেকে সেরা ৪ জনকে নিয়ে একটা টুর্নামেন্ট করা হল, এবারে প্রথম দশজন যারা হল, তাদের প্রথম জনকে হাজার টাকা পুরস্কার এবং বাকি ন'জনকে ন'শো, আটশো, সাতশো এই ভাবে দশম জনকে একশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হল। কয়েকবছর এরকম প্রতি-যোগিতা চালানোর পর পশ্চিমবাংলায় নিশ্চয় একশো জন শক্তিশালী খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, দাবা চর্চা কম বয়স থেকে করতে শুরু করলে তার একটা ফল হবেই। এর জন্য অবশ্যই সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষকে চেষ্টা করতে হবে। স্কুলে দাবা শেখানোর ব্যবস্থা করলে একটা বড় সুবিধে হয় সেটা হল, জায়গা পাওয়া যায়—সে খেলার জন্যই হোক বা প্রতিযোগিতার জন্যই হোক। স্কুলে স্পোর্টস

কিস্তিমাত

বিভাগকে এরজন্য সামান্য কিছু বেশি টাকা খরচ করতে হবে। একটা স্কুলে তিন সেট দাবা এবং ঘুঁটি দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। তিন সেটের দাম ত্রিশ কি চল্লিশ টাকার বেশি নয়। ঐ টাকা নিশ্চয় স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু নয়। ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার জন্য খরচও বেশি, জায়গাও প্রচুর দরকার। দাবায় সে সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে।

দাবার আর একটা সুবিধে হল বৃষ্টি হোক, শীত হোক, সন্ধ্যে বা রাত হোক এ খেলা চলতে পারে। অবশ্য খুব গরমের সময় দাবা প্রতিযোগিতা না হলেই ভাল, কিন্তু এটা যেহেতু গরমের দেশ প্রয়োজন হলে তাও করতে হবে। দাবা শেখানোর জন্য অবশ্য একজন ইন্সট্রাকটর দরকার হবে, পশ্চিমবঙ্গ দাবা অ্যাসোসিয়েশনকে আর্থিক সাহায্য দিলে এ কাজটা তারাই করতে পারবেন। তাদের প্রেরিত ইন্সট্রাকটর এক একটি স্কুলে বছরে সাত দিন গিয়ে ছেলেমেয়ে-দের দাবার আবশ্যিক আইন কানুন শেখাবেন এবং উৎসাহ দেবেন। অর্থাৎ এক কথায় দাবার ব্যাপারে রাষ্ট্র, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই উৎসাহিত হবেন, নইলে এর অগ্রগতি হতে পারে না। এর মানে এই নয় যে প্রত্যেককেই দাবা খেলা শিখতে হবে বা জোর করে শেখানো হবে। দাবা এদেশে জনপ্রিয় নয় এবং কোনদিনই ফুটবল বা ক্রিকেটের মত জনপ্রিয় হবে বলে মনে হয় না। তবু একশো ছাত্রের মধ্যে একজন ঠিকমত আগ্রহ প্রকাশ করলেই একটা বিরাট সংখ্যার সন্ধান মিলবে। তারপর আস্তে আস্তে গুণগত উৎকর্ষ বাড়ানোর কথা ভাবা যেতে পারে। প্রথমেই তাই দরকার বেশ কিছু ছাত্রের প্রাথমিক উৎসাহ।

আমি এখানে ব্যতিক্রমদের কথা ধরছি না। ব্যতিক্রমরা নানারকম বিরোধিতা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেন। স্টাইনিৎজকে জীবন সংগ্রামে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, আলেখিনও দাবাকেই বেছে নিয়েছিলেন পেশা হিসেবে। শ্লেখটারতো দাবা প্রেমে এমনই ডুবে গেলেন যে শেষ পর্যন্ত, প্রায় অনাহারে মরতে হল। আলেখিনও শেষ জীবনে এক বন্ধুর কাছে হাত পেতে চাইলেন কিছু পয়সা। বললেন, আমার সিগারেট কেনার পয়সা পর্যন্ত নেই। একজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের কী শোচনীয় পরিণতি! মারা গেলেন তিনি বিনা চিকিৎসায়, অনাহারে। এইভাবে দাবার জগতকে গৌরবান্বিত করে গেছেন বহু মানুষ। ফিশারকেও দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আমেরিকা থেকে ইউরোপে গিয়ে খেলার মত টাকা সংগ্রহের জন্য তাকেও কম কষ্ট করতে হয়নি। অর্থ, অর্থ, অর্থ— দাবা খেলোয়াড়দের জীবনে যেটার এককালে ছিল দারুণ অভাব। কিন্তু দিনকাল পাল্টে গেছে। এখন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হতে পারলে চাকরি পেতে কোনো অসুবিধে হবে না, তারপর গ্র্যাণ্ডমাস্টার হতে পারলে অর্থাভাব কিছু কথা নয়। অন্তত না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না। আর একবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে হাতে এসে যাবে নানা ভাবে কয়েক কোটি টাকা। তাই খেলাটিকে একেবারে আর তুচ্ছ করা যায় না।

এ-তো বড় রঙ্গ যাদু

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার



এ-তো বড় রঙ্গ যাদু,
এ-তো বড় রঙ্গ!
তিন-'স্পিনার' দেখালে মাঠে
যাবো তোমার সঙ্গ!!

যাদব 'স্পিনার', ঘাউড়ি 'স্পিনার'
আরও 'স্পিনার' চাই?
এখন মাঠের সেরা 'স্পিনার'
দিলীপ দোশি ভাই!!

এ-তো বড় রঙ্গ যাদু,
এ-তো বড় রঙ্গ!
তিন-'সাবাস্' দেখালে মাঠে
যাবো তোমার সঙ্গ!!

'সাবাস্' কপিল, বিশ্বনাথ আর
সেরা 'সাবাস্' কার?
সবার চেয়ে 'সাবাস্' যাদু
সুনীল গাভাসকর!!

ওলিম্পিকের গপ্পো

লেখা : অশোক চট্টোপাধ্যায় রেখা : জি. সান্তা



শাক্যদেব : উনি ধীরে ধীরে তাতছিলেন। অথচ আকাশের গনগনে থালাটি তখন মিঠেকড়া রোদ ঢালছিল। সেই তাপে পিঠ জুড়োয়। ওই রোদে পিঠ বেঁকিয়ে দুপুরের অল্প অবসরে মধ্যবিত্ত গিন্নীরা কাঁথা বোনে, চুল শুকোয়। ডিসেম্বরের সূর্য তৃপ্তি ঢালে কলকাতার রাস্তায়, জানলা গলে ঘরের মেঝেয়, বাড়ির ছাদে আর প্রায় বৃদ্ধ মানুষের পিঠে। তৃপ্তি, স্বস্তি—তবু মণ্টুবাবু তাতছিলেন।

আমি নির্বাক। বসেছিলাম। জানি এখানে আর কিছু বলার নেই আমার। যা বলার বলেছি। এবার উনি বলবেন।

কিন্তু উনি বলছেন কই? এযে সাত চড়েও রা কাটে না? একটু একটু খোঁচা দিই, উনি হাসেন। গর্বিত নয়, তাচ্ছিল্যের হাসি, ক্ষমার হাসি। ভাবখানা এই—ওরা বলবেই, ওদের বলতে দাও। ওরা জানে না ওরা কী বলছে।

★

মণ্টু ব্যানার্জিকে পাকড়াও করেছিলাম হঠাৎই। হুট করে দেখা। একটা পা এখন একটু টেনে হাঁটেন। সেই ট্রাম অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই। হাঁটুতে অ্যাত্তোবড় কাটা-ছেঁড়া-সেলাইয়ের দাগ। টকটকে রংটা এখনও জেল্লুস হারায়নি। ইয়া দশাশই চেহারা, মস্ত কাঁধ, চওড়া বুক আর মাথাভর্তি সাদা-কালো চুলের সঙ্গে পুরু গোঁফ জমিদার জমিদার ছবিটি ভাসিয়ে তোলে। কিংবা কখনও মনে হতে পারে ডাউনহিলের এই সাহেবটি হুট করে কখন যেন ভারতীয় হয়ে গেছেন। বাঙলা বলেন বাঙালীর মতো, ইংরেজিটা সাহেবী।

অনেকদিন পরে দেখা। চিনেছেন ঠিকই। কিন্তু সেই গাম্ভীর্যটা একইরকম রেখে একটু হাসলেন। 'কেমন আছিস?' বললাম 'ভালই'।

একটু পরেই ইনিয়ে বিনিয়ে কথাটা পেড়েছিলাম। শুনে বললেন: ওতে কিস্যু হবে না। ওরা বলবেই, ওদের বলতে দে। শুধু শুনে যা। মন্তব্য করিস না। ওগুলো ওদের কানে ঢোকে না। ওরা ভাবে ক্রিকেটের সবটুকু ওরাই জানে, ওরাই বোঝে।

আমি তবু নাছোড়বান্দা। উনি হাসলেন। বললেন, 'বেশ বাড়ি আসিস একদিন।'

★

এসেছি অনেকক্ষণ। বাড়ির গায়ে লেখা 'ব্যানার্জি ভবন'। ওর ঘরে গেলাম। ডিসেম্বরের রোদ লুটোপাটি খাচ্ছে ঘরের মেঝেয়, খাটে, বিছানায়। ওর শরীরে বিলি কাটছে মিঠে কড়া রোদ, আমার চুলে। আমার কাছে উপভোগ্য রোদ ওর শরীরে তাত ধরাল। বিছানা ছেড়ে জানলা জোড়া পর্দাটা টেনে দিলেন।

খুব ছোট্ট ছোট্ট প্রশ্ন। অবজেকটিভ টাইপ। আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। এক একটা উইকেট বত্রিশ ইঞ্চি। চার ইঞ্চি মাটিতে পোঁতা থাকে,

'ক্রিকেটের ধারা বিবরণ যারা দেন, তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে'



আঠাশ ইঞ্চি ওপরে। তিনটে স্টাম্প নিয়ে উইকেট। চওড়ায় সবসমেত নয় ইঞ্চি, সেণ্টিমিটারে মাপ জানি না।

বাঃ, বেশ বলেছিস তো? এবার তাহলে নিজের বুদ্ধিতে বিচার কর, অত দূর থেকে, অত উঁচু থেকে ওরা ঠিক বলে দিচ্ছেন বলটা অফ স্টাম্পে পরে স্পিন করে লেগ স্টাম্প বা মিডল স্টাম্পের ওপর ছিল। কিংবা, অফ স্টাম্পের ওপর বলটা পড়ে সুইং করে 'ফিফথ স্টাম্পের' ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল উইকেটকীপারের হাতে। লিখে নে, এসব বাতুলতা। এগুলো খালি চোখে কোনদিন বলা যায় না, যাবেও না।

ধারা বিবরণ যারা দেন তাদের ব্যাপারেই জানার ইচ্ছে আমার। মণ্টু ব্যানার্জি স্পষ্ট বললেন: ওদের ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা আছে নিশ্চয়। তা যদি না থাকবে তাহলে ওই অতদূর থেকে, যেখান থেকে মাঠের মধ্যে সব্বাইকে তিন ফুটি বলে মনে হয়, ব্যাটকে মনে হয় স্কেলের মতো, বলকে নাড়ুর মতো, সেখান থেকে কী করে কেমন করে তারা বলে দেন বলটা স্টাম্পের একচুল ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল? কিম্বা ব্যাটের ঠিক বাইরের কানায় চুমু খেয়ে বলটা উইকেটকিপারের পাশ দিয়ে চার হল?

'তাহলে কী করে এবং কেন ওরা বলেন এসব?' আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম মণ্টুবাবুর দিকে। উনি এবারও হাসলেন। মুচকি হাসি, অর্থপূর্ণ। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছেন আর গোঁফে হাত বুলোচ্ছেন মণ্টুবাবু। পাঁচ সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড। মণ্টুবাবু বললেন, 'কী করে বলেন সে তো বললামই। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা আছে ওদের। তবে কেন বলেন, তা বলতে পারব না। সম্ভবত টম্ভবত বলার বালাই নেই। স্ট্রেট বলে দিচ্ছেন—অ্যাক্রিয়ার কেস অফ এল বি ডবলিউ বাট আম্পায়ার সেড নট আউট। বোঝ—ওখান থেকে এল বি ডবলিউ বলে দিচ্ছেন। কিম্বা বলছেন, বলটা লেগ স্টাম্পের বাইরেই বেরিয়ে যেত; আম্পায়ার তাই আউট না দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন।

দুশ গজ দূর থেকে এসব বলা যায় না। সোজাসুজি আমি বলে দিচ্ছি, লিখে নে—বলা যায় না, বোঝা যায় না। কেউ বলতে পারে না।

আর কী বলা যায় না? বোঝা যায় না?—আমি প্রশ্ন করলাম। উনি বললেন, 'কোন্ একটা কাগজে যেন পড়লাম সেদিন—প্রতিবেদক স্পষ্ট লিখেছেন, মাদ্রাজে চেতন চৌহানের ক্যাচটি জমিতে পড়ার পরই স্লিপে মঞ্জিদ ক্যাচ ধরেছেন। চেতন আউট ছিলেন না। এটাও বলা অসম্ভব। এ সমস্ত ঘটনা মাঠের সব থেকে কাছের বিচারক আম্পায়ারই যখন বুঝতে পারেন না তখন ওই ওখান থেকে, প্রেস-বক্স থেকে কি বলা যায়? যায় না। লেগ বিফোর উইকেটও সময় সময় আম্পায়ারকে ধন্ধে ফেলে দেয়। বলের মুভমেন্ট—বিশেষ করে লেট সুইং—মাঠের বাইরে থেকে বোঝাও এক কথায় অসম্ভব। আউট সুইং, ইন সুইং আমরা বুঝতে পারি ব্যাটসম্যানের শোপ দেখে। কীভাবে খেলছে তা দেখে। অর্থাৎ খেলার ধরন দেখে। কমেণ্টেটররা সবসময় উইকেটের সোজাসুজি বসেন না। অনেক সময় বেশ কয়েক ফুট আড়াআড়ি বসতে হয় তাদের। সুতরাং অত দূর থেকে ওভাবে কমেন্ট করা শিয়র টমফুলারি। বোকামো।

তাহলে কমেণ্টেটররা কী বলবেন?

কী আবার বলবেন? যেমনভাবে খেলা এগোচ্ছে সেইভাবে তারাও তার বিবরণ দেবেন। যতটুকু বোঝা যায়, যতটুকু বলা যায়, ততটুকুই বলবেন। তার কম না বেশি না। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রবাদটা জানিস তো? তেমনি এক্তিয়ারের বাইরে বেশি বলতে গেলেই বাতুলতা প্রকাশ পায়।

আর কিছু জানার নেই। এবারে উঠব। বেলা অনেক হয়েছে। মণ্টুবাবু বললেন 'আবার আসিস'। তারপরেই বললেন, 'শোন, সবাই সব কথা বলে না, আমি বললাম। অনেকের পক্ষে অনেক কথা বললে ক্ষতির ভয় দেখা দেয়। আমার কোনও ভয় নেই, পিছুটান নেই। তবে সব কমেণ্টেটররাই কিন্তু এক নন। কেউ কেউ নিজেদের সংযত করতে জানেন। তবে সবাই নন। যারা নন তাদের উদ্দেশ্যেই এগুলো বলা। আসলে I have my doubts as to how many commentators are cricketers. They should not forget that there are knowledgeable cricketers amongst the listeners.●

আগা খান গোল্ড কাপে চীনের ছেলেরা সবার মন জয় করেছে

ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদ : বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল আসর আগা খান গোল্ড কাপ শেষ হলো ঢাকায় গতকাল। ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯। চূড়ান্ত খেলায় এবারের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল বিদেশী দুই দল। গণচীনের লিয়াও পিং ফুটবল দল আর ইন্দোনেশিয়ার নিয়াক মিত্রা দল। প্রথম নব্বই মিনিটের খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়ে যাওয়ায় ১৫ মিনিট করে দু'ভাগে ৩০ মিনিট বেশী খেলিয়েও খেলার ফলাফল অমীমাংসিত। অতএব টাইব্রেকারে নির্ধারিত হলো চ্যাম্পিয়নশিপ। আর টাইব্রেকারে নিয়াম মিত্রার সুটাররা পাঁচটির মধ্যে তিনটিতে গোল পেয়ে খেলায় বিজয়ী হলো শেষ পর্যন্ত। চীনের খেলোয়াড়দের দুর্ভাগ্য ; সারা খেলায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেও যেমন একটার বেশী গোল পায়নি তেমনি টাইব্রেকারে মাত্র একটা গোল পাওয়ায় রানার্স হয়ে বিদায় নিতে হলো তাদের।



সেরা খেলোয়াড় প্যাট্রিক উই (সিঙ্গাপুর)

চীনের খেলোয়াড়রা ছোট ছোট পাশে নিজেদের মধ্যে দারুণ সমঝোতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে খেলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দাপটে খেলে নাস্তানাবুদ করেছিলেন নিয়াক মিত্রার খেলোয়াড়দের। বারে বারে হামলা চালিয়ে ইন্দোনেশীয় রক্ষণভাগকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়েও গোলে জোরালো সট না নিতে পারায় তারা গোল পাননি। অপরদিকে 'হামলায়' ব্যতিব্যস্ত ইন্দোনেশিয়রা তাদের কোন পরিকল্পনাকেই কাজে লাগাতে পারেননি। সারা খেলায় তারা ব্যস্ত ছিলেন চীনের হামলাকে প্রতিহত করতে। প্রতিটি আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়কেই বাধ্য হয়ে নীচে নেমে ঘর সামলাতে ব্যস্ত দেখা গিয়েছিল। তাই বলে একেবারে যে তারা আক্রমণ করেননি তা বলা চলে না। তাদের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রাও কম যান না—দলবদ্ধভাবে আক্রমণের সুযোগ তারা খুব একটা না পেলেও লম্বা পাশের মাধ্যমে পিছনে থেকে যে বলই সামনে গেছে তাকে কাজে লাগিয়ে গোল পাওয়ার চেষ্টার ত্রুটি করেননি। আর প্রথম দিকের খেলাতে তো তারা এমন কোণঠাসাও ছিল না, তাই দর্শনীয়ভাবে চীনের গোলমুখে জটলার মধ্যে থেকে দেওয়া দুল্লা রহিমের একটা বলকে কাজে লাগিয়ে গোল পেতে একটুও বেগ পেতে হয়নি তুখোড়, সুযোগ সন্ধানী আরিফিনের। আর সেই দর্শনীয় গোলের সুবাদে তারা বেশ কিছুক্ষণ : প্রায় ৪০ মিনিট এগিয়ে ছিল প্রথমার্ধে। চীনের খেলোয়াড়রা আচমকা একটা গোল খেয়ে একটু যেন ঘাবড়ে যান। কিন্তু সেটুকু সামলাতে যতটা সময় লেগেছিল সেটা বাদ দিলে তারপরের সমস্ত সময়ে ছিল তাদেরই দাপট। ৪১ মিনিটে ফ্যান গোয়ার সিন গোল করে শুধু সমতায় আনেননি খেলাতে ; তারা সারা খেলাটাকেই নিজেদের আয়ত্বে রেখে ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়দের নাস্তানাবুদ করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার গোলরক্ষক পরওনোও কম যান না। চৈনিক একাধিক হামলাকে তিনি প্রতিহত করেছেন। চীন দল এ'ভাবে খেলেও একটার বেশী গোল পায়নি। খেলা গড়িয়েছে বর্ধিত সময়ে। সে সময়েও কোন দল গোল না পাওয়ায় খেলার মীমাংসা হয় টাইব্রেকারে। আর তাতে ইন্দোনেশিয়ার গোলরক্ষক চীনের দুটো সটকে আটকে দিয়ে আগা খান গোল্ড কাপ বিজয়ী হতে সাহায্য করেছে। টাইব্রেকারে ফলাফল গেছে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ৩-১ গোলে এগিয়ে থাকার সুবাদে।



সোনার হরিণ হাতে ১৯৭৭ সালের সেরা ক্রীড়াবিদ আবদুস সালেক

চীনের খেলোয়াড়দের ক্ষোভ নেই। তা:দর খেলার আচার, ব্যবহার সর্বত্রই প্রশংসা পেয়েছে। দলনায়ক বলেছেন 'আমরা গোল্ড কাপ নিতে আসিনি, আমরা এসেছি ফুটবল খেলতে, বন্ধুত্ব করতে, খেলা দেখতে আর সবার কাছে খেলা শিখতে।' গোল্ড কাপে ভালো খেলে টাইব্রেকারে গোল না পেলেও তাই তাদের অখুশী এমন মনে হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার দল এর আগেও আগা খান গোল্ড কাপ জিতেছে। আর তারা শুরু থেকেই কাপ জেতার খেলা খেলতে চেয়েছে—তাদের খেলা দেখে ঢাকার দর্শক খুশী। তবে শেষের দিকে অনেক দিন ঢাকায় থাকার দরুণ তাদের বাড়ী ফেরার জন্য অস্থির মনে হয়েছে। ইন্দোনেশিয় দলের খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই তুখোড় খেলোয়াড় তবে চীনের মত অত সমন্বিত নন। আধুনিক ফুটবলের শিক্ষানবীশ তারা, তা বোঝা গেছে তাদের খেলার গতিতে, পরিকল্পনায়, আক্রমণের ধারা রচনায় কিম্বা হামলা প্রতিহত করার কায়দা দেখে।

আগা খান গোল্ড কাপের চূড়ান্ত খেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার। খেলার শুরুতে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে। এই পরিচিতি অনুষ্ঠানে এবং পরে পুরস্কার বিতরণে উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি ক্যাপ্টেন সিদ্দিক আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ও ঢাকার মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসানত।

বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে এ টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় মনোনীত করেছেন সিঙ্গাপুর দলের গোলরক্ষক প্যাট্রিক উইকে। অনবদ্য দক্ষতায় প্রতিটি খেলাতে উই ঢাকার দর্শকদের মোহিত করেছেন। উইকে সমিতির প্রতীক ধাবমান হরিণ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।



গোল্ডকাপ বিজয়ী ইন্দোনেশিয়ার নিয়াক-মিত্রা দল

সেরা খেলোয়াড় দুলাহ রহিম (ইন্দোনেশিয়া)



এবারের টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় বাছাই করেছেন ক্রীড়া সাংবাদিকরাও। তাদের মতে ইন্দোনেশিয়ার দুলাহ রহীম সেরা খেলোয়াড়। সেরা খেলোয়াড় ছাড়া ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতি টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশী গোলদাতা চীনের লিয়াও নিং ক্লাবের জাই জেন চেংকেও পুরস্কৃত করেছেন।

এতো গেল চূড়ান্ত খেলার দিনের ঘটনা। তার আগে দুটো সেমিফাইনাল আবাহনী ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে দারুণ খেলেও ২-০ গোলে হেরে গেল। উপচে পড়া ঢাকা স্টেডিয়াম আশা করেছিল আবাহনী দল একটা গোল পাবে। কিন্তু তারা চেষ্টা করেও গোল পায়নি। আর অপর সেমিফাইনালে হারলো বার্মা চীনের কাছে ২-১ গোলে। এ দুটো ম্যাচ ছাড়া রবীন লিগের অপরাপর খেলাগুলোও খুব জমেছিল। প্রত্যেকটি খেলাতে লোকও হয়েছিল প্রচুর।

যাই হোক এবারের আগা খান গোল্ড কাপ শেষ হয়েছে। নানান কথা উঠেছে। অনেকেরই মন ভরেনি। আগা খানে প্রতিবেশী বন্ধু দেশ ভারতবর্ষের একটা নামকরা দল অংশ নিক এটা সব সময় ঢাকার দর্শকরা কামনা করেন। এবারে যদি একটা দল আসতো তাহলে সকলেই খুশী হত। আগামীতে দেশের সংখ্যা না বাড়িয়ে ভালো দলের সংখ্যা বাড়ুক এ দাবী উঠেছে সর্বত্র।

এশীয় বাস্কেটবলে বাংলাদেশ

জাপানের নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিত ১০ম এশীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ জাতীয় দল অংশ নিচ্ছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় বাস্কেট-বল দল বিদেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলায় অংশ নিতে গেছে। বাংলাদেশের কয়েকজন তুখোড় খেলো-য়াড় নিয়েই বাংলাদেশ দল গঠিত হয়েছে। হয়ত তারা ফলাফলে খুব একটা ভালো কিছু করতে পারবেন না। তবু যে অভিজ্ঞতা তারা ওখানে অর্জন করবেন তা যদি জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগান তাহলে সকলে সাধু-বাদ দেবেন।

এশীয় দাবায় বাংলাদেশ

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশীয় দাবা চ্যাম্পিয়নে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলা-দেশ জাতীয় দাবা দল সম্প্রতি সিঙ্গাপুর গেছে। বাংলাদেশ দলকে খেলতে হয়েছে বি গ্রুপে। এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বাংলা-দেশ দল নিজ গ্রুপে শীর্ষ দল হয়েছে। বাংলাদেশের সংগৃহীত পয়েন্ট হচ্ছে ২২-১/২। মোট পয়েন্ট ছিল ২৮। বাংলাদেশ দলকে খুব কাছাকাছি অনু-সরণ করছে সিঙ্গাপুর দল ১৯-১/২ পয়েন্ট পেয়ে। তারপর রয়েছে আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়া সাড়ে আঠারো করে পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এদের পরে রয়েছে জাপান ১২ পয়েন্ট, ব্রুনেই ১১-১/২, পাপুয়া নিউ-গিনি ৪ এবং কোয়েত ১-১/২ পয়েন্ট পেয়ে।

বাংলাদেশ পাকিস্তানী টেস্ট ক্রিকেট দল আসছে

রাজধানী ঢাকা আর বন্দর-নগরী চট্টগ্রামে দুটো ম্যাচ খেলার জন্য ভারত সফররত পাকিস্তানী ক্রিকেট দল এ মাসের ৩১ তারিখে ঢাকায় পৌঁছুবে। ঢাকা স্টেডিয়ামকে ক্রিকেট উদ্যোগী করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—কাজ চলছে—সময় অল্প—হয়ত বা আশানুরূপ পিচ হবে না তবু খেলা হবে।

মাঠ ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে পাকি-স্তানীদের বিরুদ্ধে দল গঠন করার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দেশের ২৪ জন খেলোয়াড়কে নেটে ডেকেছেন ইতিমধ্যে। ১০ তারিখ থেকে রীতিমত অনুশীলন চালাবেন কোচ আলতাফ হোসেন। যেসব খেলোয়াড়রা নেটে আসছেন তারা হলেন ঃ শফিকুল হক হীরা, আশরাফুল হক, ইউসুফ রহমান বাবু, জিয়াউল ইসলাম মাসুদ, রফিকুল আলম, রকিবুল হাসান, ওয়াহিদুল গনি, মাইনুল হক, ইয়াজদানী, মঞ্জু, আহমেদ ইকবাল, ওমর খালেদ মনী, নজমুননূর রথীন, জাহাঙ্গীর শাহ বাদশা, সদরুল আনম খান, অলোক চক্রবর্তী, দীপু রায় চৌধুরী, জি এস হাসান তামীম, চেহান হাসান, মজিবুল হক মন্টু, সামিউর রহমান, যোগেশ ও মুনীর। ●

ছবি ঃ খন্দকার তারেক ১১.১২.৭৯



গোল্ডকাপ ফুটবল ফাইনালের একটি মুহূর্ত।

বলো দেখি

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন ঃ

১। পালকের বল ওড়ে নিচে থাকে নেট্
বল দেখি বলটির কতখানি ওয়েট ?

২। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে
শূন্য, সাত উইকেটে ? কোথায়, কাদের খেলায় ?

৩। হাতে লাঠি খেলে হকি, কত তার গুণ
প্রথম ভারতের মেয়ে হয় অর্জুন ? কে ?

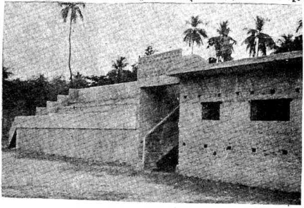
৪। ছোট্ট সফেদ বল নেচে নেচে যায়
পিংপং ডিংডং কত গান গায়
বল দেখি বলটির কতখানি ব্যাস ?
একটুকু ভেবে বল হয়ো না'ক Rash।

৫। ঝুড়ি আর বল মিলে বাস্কেটবল
বল দেখি কোন প্লেয়ার সবথেকে tall ?



উত্তর ঃ
১। 73—85 grains, ২। লর্ডস মাঠে ১৮৭২ সালে M C C বনাম Surrey, ৩। এ্যান ল্যামসডেন (১৯৬১), ৪। 37.2—38.2 mm., ৫। ভাসিলি এ্যাখটায়েড, সোভিয়েত রাশিয়া ৭' ৭.৩" লম্বা।

উলুবেড়িয়ার স্টেডিয়াম এখনও দূর-অস্ত



সংবাদদাতা : হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমায় স্টেডিয়ামের কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েও শেষ হল না। সম্প্রতি এই স্টেডিয়ামের খরচ বাবদ রাজ্য সরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই টাকায় সামান্য গ্যালারি ও প্যাভিলিয়ন তৈরি হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। আরও কিছু টাকার জন্য কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়েছে।

কয়েকবছর আগে উলুবেড়িয়া থানা ক্রীড়া সংস্থার যে মাঠে ফুটবল খেলা চলত বর্তমানে সেখানে গড়ে উঠেছে মহকুমা হাসপাতাল। ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে টাকা রাজ্য সরকার থেকে পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে ১২ বিঘা জমি কেনা তখন সম্ভব হয়নি। তারপর ৬৪ সালে স্থানীয় ক্রীড়া পিপাসুরা অধিবাসীদের কাছে জমি কেনার জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করেন। সেই বছর ১২ বিঘা ধান জমি কেনা হল। কিন্তু তারপর উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। এরপর দীর্ঘ চার বছর মাঠের জন্য কোন কিছুই করা হয়নি। '৬৮ সালে জলাজমি ভর্তি করে মাঠ তৈরির কাজ শুরু করার জন্য নতুনভাবে কমিটি গঠন করা হল। সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালেন নতুন কমিটি। অবশেষে '৭৪ সালে তদানীন্তন মহকুমা শাসকের আগ্রহ এবং উৎসাহে প্রথম পর্যায়ে ৭১,৩৭৭ টাকা সরকারী অনুদান পাওয়া যায়। পরবর্তী ধাপে '৭৭ সালে জেলা শাসকের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যায় মাঠের অন্যান্য কাজ শেষ করার জন্য। এছাড়া স্থানীয় তহবিল থেকে নয় হাজার টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যায়। আগের কমিটি ভেঙে দিয়ে পাঁচজনকে নিয়ে নতুন কমিটির হাতে মাঠের পার্শ্বস্থ প্রাচীর, গ্যালারি এবং অফিস ঘর নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ এখনো দূর-অস্ত। মাঠটিকে এখনও ঘেরাও যায়নি। সেখানেও টাকার অভাব।



জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড বোরোলীন হাউস কলকাতা ৭০০ ০০৩
GD 3160

ফিল্ড হকি ও মস্কো ওলিম্পিক

অতীন সরকার: ফিল্ড হকির ইতিহাসে মস্কো ওলিম্পিক এক বিশেষ অধ্যায় সংযোজন করবে। এই ২২তম ওলিম্পিকেই প্রথম মহিলাদের ফিল্ড হকি চালু হচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বের ফিল্ড হকি ক্রীড়াঙ্গনে নবাগত এবং অন্য ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ দক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের হকি দল এই প্রথম ওলিম্পিক ফিল্ড হকিতে অংশগ্রহণ করবে। তবে প্রাথমিক বা এলিমিনেটিং স্তরে বিজয়ী হয়ে তাদের আসতে হবে না। উদ্যোগী দেশ হিসাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন অংশগ্রহণ করবে। তাও আবার পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও বলে রাখা যায়। তা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন আইস হকি এবং তারই সহযোগী ব্যাণ্ডি (হকি)-তে বহুকালের সুদক্ষ। আসন্ন ওলিম্পিকে হকি প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচনার আগে ফিল্ড হকির ইতিহাস দেখা যাক।

বিশ্বের প্রাচীনতম খেলাগুলির অন্যতম এই 'স্টিক এ্যাণ্ড বল' অর্থাৎ ফিল্ড হকি খেলাটির উৎপত্তি হয়েছিল ২000 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যে। অবশ্য এটা নির্ভরযোগ্য অনুমান মাত্র। মধ্যযুগে এই খেলাটি ইউরোপের বিভিন্ন অংশে প্রসারিত হয়েছিল। তবে কিছুকালের মধ্যেই দেশের 'প্রতিরক্ষার স্বার্থে' ধনুর্বিদ্যার সঙ্গে হকিও ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার এই ইংল্যাণ্ডেই গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বা আজ থেকে সওয়া শ' বছর আগে আধুনিক ফিল্ড হকি শুরু হয়। তারপরে এই পদ্ধতিই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং আধুনিক চতুর্থ ওলিম্পিক—১৯০৮, (যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন ওলিম্পিক প্রচলনকারী গ্রীসের রাজধানী এথেন্স শহরে) থেকে পুরুষদের ফিল্ড হকি অন্যতম বিষয়। প্রথম ওলিম্পিক ফিল্ড হকি চ্যাম্পিয়ন গ্রেট ব্রিটেন। তারপরের ২টি ওলিম্পিকে ফিল্ড হকি প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯২০ সালেও গ্রেট ব্রিটেন চ্যাম্পিয়ন। তারপরের ওলিম্পিক (১৯২৪) ফিল্ড হকি ছিল না। ১৯২৮ সালে আবার ফিল্ড হকি অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই থেকে একটানা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ৬টি ওলিম্পিকে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করে। ইতিমধ্যে অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ওলিম্পিকে ভারত উপমহাদেশের আগেকার একটি দল ভারত ও পাকিস্তান এই দু'দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্বর্ণপদক আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারপরে ক্রমে ক্রমে ভারত অনেক নীচে নেমে গেছে এবং মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে ফিল্ড হকিতে সে কোন পদকই পায়নি।

এখন ফিল্ড হকিতে ব্রিটেন, কানাডা, দুই জার্মানি, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ভারত, পাকিস্তান ও নবাগত সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। হকিতে প্রচলিত একাধিক পদ্ধতির মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পরে ভারতে-দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক খেলাও হয়েছে। সোভিয়েত দল ভারতে এসে একটি খেলায় ভারতকে পরাজিতও করে। অথচ মাত্র ৮/৯ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিল্ড হকি চালু হয়।

অপরদিকে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে এই খেলাটি এখন বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কয়েকমাস আগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা– ৭ম স্পার্তাকিয়াডের প্রথম পর্বে ১১৫টি হকি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে কাজাকিস্তান দল রুশ ফেডারেশন দলের সঙ্গে টাইব্রেকারের সামনে পড়ে এবং মোট গোল সংখ্যার-হিসাবে জয়ী বলে ঘোষিত হয়। এছাড়া এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় (গত আগস্টে মস্কোতে অনুষ্ঠিত) ভারত, জি ডি আর এবং চেকোস্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হয়।

আসন্ন ওলিম্পিকে হকিতে তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বিশেষ ভূমিকা নেবে এবং তারা অঘটন ঘটালেও বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। এই ওলিম্পিকে পুরুষদের ১২টি এবং মহিলাদের ৬টি দল অংশগ্রহণ করবে। প্রতি দলে ১৬ জন করে খেলোয়াড় থাকতে পারবে।

খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে সিন্থেটিক কার্পেটে মোড়ানো মাঠে। এই সিন্থেটিকটির নাম 'পলিগ্রাস'।

মস্কো ওলিম্পিকের হকি খেলাগুলির জন্য বল ও সরঞ্জাম সরবরাহ করবে একটি ভারতীয় সংস্থা। এই সম্পর্কে ইতিমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে ওলিম্পিক সংগঠনী কমিটি ও সেই সংস্থাটির মধ্যে। ওলিম্পিক ফিল্ড হকি শুরু হবে ২০ জুলাই। প্রথম চারদিন অর্থাৎ ২৩ জুলাই পর্যন্ত পুরুষদের ২টি বিভাগে প্রাথমিক খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। মহিলাদের প্রতিযোগিতা হবে একটি বিভাগে। মোট ১৫টি খেলায় চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে ৩১ জুলাই। পুরুষদের সেমিফাইনাল হবে ২৯ ও ৩০ জুলাই এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১ আগস্ট বিকেল ৪টায় মস্কো-ডায়নামো স্মল এরেনায়। এই মাঠেই ওইদিন বেলা ২টায় নির্ধারিত হবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান। এই ডায়নামো স্মল এরেনা ছাড়া আর একটি স্টেডিয়ামেও ফিল্ড হকি প্রতিযোগিতা একই সময়ে বলবে—সেটি হল মস্কোর ইয়ং পায়ওনিয়ার্স স্টেডিয়াম।



মস্কোতে সোভিয়েত-ভারত হকি

মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত,
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন?
আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন!

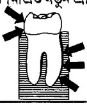
নতুন প্রমিস

এক অদ্বিতীয় টুথপেস্ট
যাতে আছে চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গের তেল!



বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট



১.
দাঁতের ক্ষয়
নিবারণ করতে
সাহায্য করে।

২.
মুখের ভেতর
তাজা রাখার দরুন
নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
হতে দেয় না।

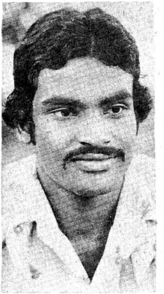


সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে...প্রমিস!

CHAITRA-BLS-369 BEN

"কেবলমাত্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যাচ্ছে।"

গোলকিপার প্রশান্ত নন্দী



সন্দীপ দত্ত : গত ২০ জুন অনুষ্ঠিত প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগে তারকা খচিত ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে অখ্যাত অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরী কালিঘাটের ম্যাচটিকে বছরের সেরা ম্যাচগুলির মধ্যে অন্যতম বললে বোধহয় বাড়িয়ে বলা হবে না। পুরো সময় না কাটা পর্যন্ত অতি বড় লাল-হলুদ সমর্থকও দলের জয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। ৫৬ মিনিটে সুরজিতের দেওয়া গোলে ইস্টবেঙ্গল জয় কুড়োলেও কালিঘাটের লড়িয়ে খেলার পাশাপাশি প্রিয় দলের খেলা সমর্থকদের খুশীর খোরাক যোগাতে পারেনি। সেদিন ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ডদের চোখা চোখা আক্রমণগুলি বারবার থমকে গিয়েছিল কালিঘাটের বিশ্বস্ত গোলপ্রহরী প্রশান্ত নন্দীর কাছে। এককথায় ডেভিড, মিহির, সুরজিত, সাজ্জাদ, সাব্বির ও দেবরাজের পা থেকে ছিটকে আসা গোলমুখি প্রচণ্ড সটগুলি সময়মত পাঞ্চ, ডাইনে বায়ে ডাইভ দিয়ে আর কখনও বা এগিয়ে গিয়ে শূন্যে লাফিয়ে বিপক্ষ ফরোয়ার্ডদের মাথা থেকে বল তুলে নেওয়াতে দক্ষতা দেখিয়েছে প্রশান্ত। সারা খেলায় মাত্র একবারই সুরজিতের কাছে ঠকে যাওয়া প্রশান্তর গোলকিপিং মাঠে উপস্থিত সমস্ত দর্শকদের মনে আগামীদিনের জন্য আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

চন্দননগর বড়বাগানের এই শ্যামলা ছেলেটি সরাসরি কলকাতার ঘেরা মাঠে খেলতে এসেছিলেন '৭৬ সালে কালিঘাট ক্লাবের তৃতীয় গোলকিপার হিসেবে। অবশ্য এই সুযোগটা সে পেয়েছিল চন্দননগর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক শিবপ্রসাদ হাজরার সহায়তায়। তার আগের বছর ('৭৫) আন্তঃজেলা জুনিয়র ও সিনিয়র ফুটবলে জয়ী চন্দননগরের গোলরক্ষায় নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েই সে ক্রীড়া সম্পাদক মহাশয়কে খুশী করতে হয়েছিল।

ছেলেবেলায় পাড়ার 'সন্তান দল' ক্লাবের মাঠে বল নিয়ে নাড়াচাড়া করত প্রশান্ত। দাদা গোপাল নন্দীর অনুকরণে পাকাপাকিভাবে গোলে দাঁড়াতে শুরু করার আগে অধীর ঘোষের কাছে গোলকিপিংয়ের প্রথা-প্রকরণগুলি জেনে নেন ৭৩ সালে ওরিয়েন্টাল ক্লাবে যোগ দিয়ে। সেখান থেকে ঝটপট ওপরের দিকে উঠে যান মাত্র দু বছরের মধ্যে এবং '৭৫-এ জেলার প্রথম ডিভিসন লিগে খেলতে নেমেই নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিয়ে জেলার জুনিয়র ও সিনিয়র দলে নিজের জায়গা করে নেন। ৭৬-এ কালিঘাটে এসে প্রথম প্রথম সাইড লাইনের বাইরে বসে থাকতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের বিপক্ষে খেলার দিন চোট পাওয়া দলের প্রথম গোলকিপার সন্দীপ দে'র জায়গায় খেলতে নেমে যোগ্যতার পরীক্ষায় ভালভাবে উতরে যান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রশান্ত কালিঘাটের গোল রক্ষা করে যাচ্ছেন। সে বছর লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অল্প বয়সী এই ছেলেটির খেলা কলকাতা দর্শকদের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। সেই ম্যাচে প্রায় ৬৬ মিনিট পর্যন্ত একা বিপক্ষ ফরোয়ার্ডদের সবরকম আক্রমণের মোকাবিলা করেছিলেন সে একজন অভিজ্ঞ গোলকিপারের মত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান মাত্র একবার কালিঘাটের জালে বল পাঠিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে খেলা শেষ হওয়ার মিনিট তিনেক আগে। অথচ সেবছর জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে বাঙলা দলের জার্সি পরা থেকে বঞ্চিত হয় ট্রায়ালে গোলকিপিংয়ের সব বিভাগে যোগ্যতা দেখিয়েও। অবশ্য পরবর্তীকালে প্রশান্তকে ডাকা হলেও নানা কারণে তাতে হাজির হতে পারেননি।

২০ বছর বয়সী লাজুক প্রকৃতির প্রশান্ত চন্দননগর বিদ্যামন্দির স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছেন দু বছর আগে। তারপর আর পড়াশোনা এগোয়নি সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হওয়ায়। সুতরাং ফুটবল নিয়ে মাঠে দাপাদাপি করার ফাঁকে ফাঁকে একটি চাকরীর চিন্তা ওর মাথায় সর্বদাই ঘুরপাক খেত। গতবছর কালিঘাট ক্লাবের মালি শরৎ-এর কথায় প্রশান্ত মাহীন্দ্র অ্যাণ্ড মাহীন্দ্র কোম্পানীর ফুটবল সম্পাদক প্রণব সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে। কোম্পানির ফুটবল টিমে তখন একজন গোলকিপারের প্রয়োজন ছিল। গতবছর মাহীন্দ্র অ্যাণ্ড মাহীন্দ্র কোম্পানির হয়ে অফিস লিগে খেলার পর কোম্পানিতে পাকা চাকরি হয়েছে এই মাস কয়েক আগে। অবশ্য এর আগে একটা অ্যালাউন্স দেওয়া হত প্রশান্তকে। বাবা সত্যেন্দ্রনাথ নন্দী সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেবার পর প্রয়োজনের সময় সংসারের আর্থিক দায় কিছুটা লাঘব করতে পেরে প্রশান্ত দারুণ খুশী।

প্রতিদিন 'কাকভোরে' ঘুম থেকে উঠে ৫-১৭ মিনিটের ট্রেন ধরে প্রশান্ত ময়দানে চলে আসেন। আগে ক্লাবের প্র্যাকটিস শেষে টিফিন খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। এখন ক্লাবের ক্যান্টিনে ডাল ভাত খেয়ে অফিসে হাজিরা দিতে ছোটে। বর্তমানে কালিঘাট ক্লাবের কোচ সুধেন্দু মুৎসুদ্দির কাছে অনুশীলন করে যাচ্ছেন প্রিয় গোলকিপার তরুণ বসুর অনুসরণে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টায়। খেলুড়ে জীবনের গোড়া থেকেই বাবা, মা ও দাদার উৎসাহ প্রশান্তকে এগিয়ে যাওয়ার পথে সর্বদা প্রেরণা দিয়েছে। ফুটবল ছাড়া গল্পের বই বা গানের টানে কেটে যায় ওর অবসর সময়টুকু।



বিকজ ইট ইজ দেয়ার

ধ্রুব মজুমদার ঃ আজ থেকে পুরো কুড়ি বছর আগে, নন্দাঘুণ্টি পর্বত অভিযানের উদ্ভট আইডিয়াটি নিয়ে, শূন্য চাঁদার খাতা হাতে যখন দেশের গণ্যমান্যদের দরজায় দরজায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন সব জায়গায়ই আমাদের সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হত সেটি হল, পাহাড়ে গেলে কি হয় ? দুত টাকা খরচ করে, এত পরিশ্রম স্বীকার করে, এত বিপদ মাথায় নিয়ে তোমরা কেন পাহাড়ে যাও ?

এখন আর স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই যে, এই অত্যন্ত প্রাথমিক প্রশ্নটির জবাব তখন আমাদের একজনেরও সঠিক জানা ছিল না। ব্যাপারটি যে খুবই শ্বাসরুদ্ধকর এবং খুবই গৌরবময় তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম—সেই বিশ্বাসটুকু সম্বল করেই মহার্ঘ নন্দাঘুণ্টি অভিযানের স্বপ্ন দেখবার দুঃসাহস। কিন্তু অমন রোমাঞ্চকর গৌরব অর্জনের তো আরও দশটা উপায় আছে—সেসব পথে গেলে রুজি-রোজগারও হয়, দেশের কাজও হয়—তবে পাহাড়ে যাওয়া কেন ?

আমরা কিন্তু নাস্তানাবুদ হবার পাত্র নই। স্বদেশী করবার সুযোগ হয়নি বটে, কিন্তু স্বদেশী নেতাদের বক্তৃতা অনেক শুনেছি—প্রশ্নটির জবাবে আমরা একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে দিতাম—'অনাদিকাল থেকে হিমালয় পর্বত ভারতভূমিকে ধর্ম দিয়েছে, জ্ঞান দিয়েছে, জল দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, শিয়রে বসে পাহারা দিয়েছে আমাদেরই হিমালয় পর্বত, সেই হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠে দেশ-বিদেশের লোকেরা বছরের পর বছর বিজয়মাল্য নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু ভারত কেবলি পিছায়ে রয়।' শেষের দিকে 'ভারত' কেটে 'বাঙ্গালী' করেছিলাম। ফল হয়নি।

শেষ পর্যন্ত যার দুঃসাহসিক বদান্যতায় আমাদের নন্দাঘুণ্টি অভিযান—ভারতের প্রথম বেসামরিক পর্বত অভিযান—সফল হয়েছিল, তিনি কিন্তু আমাদের কোন প্রশ্নই করেননি। কেন যাই, গিয়ে কি হয়, কিচ্ছু না। আমরা একেবারে থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। হাজার হাজার টাকার মামলা—প্রস্তাব পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই 'গ্রিন-সিগন্যাল' !

এমনই হয়। কোন একটা বিষয়ে সমগ্র সত্তা যখন উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন আর কার্য-কারণ বিচারের অবকাশ থাকে না, তার প্রয়োজনও হয় না। এই উন্মাদনার সামনে অনেক অসম্ভব জিনিষও সম্ভব হয়। টিকে থরাতে যাদের জামিন লাগে তাদের এক উদ্ভট অভিযানের জন্য হাজার হাজার টাকা এসে যায়—আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছে। বিশ্বের সব পর্বত-আরোহীর ক্ষেত্রেই সম্ভবত এমন হয়। কেননা, বারবার পর্বতে না গেলে পর্বতারোহণের রহস্যটা পরিষ্কার হয় না, হতে পারে না। অতএব যতদিন পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কেন ? কি ? এসব না বুঝেই পর্বতে যেতে হবে। উদ্যোগ পর্বটা সুতরাং, ঝোঁকের মাথায় সেরে ফেলতে হয়।

প্রশ্নটা তবু থেকেই যায়—পাহাড়ে কেন যাও ?—সব পর্বতারোহীকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বারম্বার এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। পর্বতারোহীরা আবার জবাবদিহির কথা শুনলেই চটে ওঠে। বলে, হাজারটা জবাবদিহি যদি দেব তবে লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে যাব কোন দুঃখে ! অথচ জবাবদিহি না করে উপায়ও নেই—রাহা-খরচ যে দেয় সে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবেই।

হাজার জনের কাছে জবাবদিহি করতে করতে কিম্বদন্তীর পর্বতারোহী ম্যালোরি একবার রেগে গিয়ে দুম করে বলে ফেলেছিলেন ঃ পাহাড়টি আছে তাই যাই। আসল মন্ত্রটা আরও সংক্ষিপ্ত ঃ বিকজ ইট ইজ দেয়ার। একেবারে সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, বাইবেলের মতো সহজ ভাষায়। তবে মুশকিল এই যে, ধর্মকথারই মতো, এই মন্তব্যাক্যের যাথার্থ্য বুঝতে হলে তার আগে পাহাড়ের নেশায় একেবারে বুঁদ হতে হবে ; পাহাড়ের নির্জনতায় দেহমনের যাবতীয় কোলাহল শুদ্ধ হলে তারপর এই মন্ত্রের মর্মোদ্ধার হবে। তবুও নাবালক পর্বতারোহীরা অনেক সময় উপরের মন্ত্রটি আউড়ে নিজেদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে থাকে—ব্যাপারটিকে যতদিন বৈষয়িক বৈভবের সোপান বলে চিনতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত।

অপর দিকে হিমালয়ে পর্বতারোহণের অন্যতম পথিকৃৎ এরিক সিপটনের বিধান হল হিমালয়ের পথ যারা চিনেছে তাদের হিমালয়ে যাওয়াই মঙ্গল। পাগলকে যে পাগলা-গারদে রাখাই মঙ্গল এটুকু না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এতো চিকিৎসা-বিধি, রোগের হেতুটা কি ? মূলটা কোথায় ? মানুষ আদৌ কেন পাহাড়-পাগল হয় !

হিন্দু নামে জাত যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের কাছে এটা একটা প্রশ্নই ছিল না। মহাভারতেরও অনেক অনেক আগে থাকতে তারা হিমালয়—মানে গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ অতিক্রম করে ফি বছর কৈলাস মানস সরোবর যেতেন—পর্বতারোহীদের যারা ঈর্ষার বস্তু—তারা পাহাড়ে যেতেন ধর্মের জন্য। ধর্ম মানে রিলিজিয়ান নয়; মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ নির্ভেজাল অংশটুকু নিয়ে এর কারবার। অন্তত এইটুকু বিধর্মীরাও স্বীকার করে থাকেন যে সাইট সিলেকশনে, মানে স্থান নির্বাচনে হিন্দুরা ছিলেন যাকে বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শিবের হেড কোয়ার্টার্স করলেন কোথায়, না মানসের পারে কৈলাসে। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, মুক্তিনাথ—হিমালয়ের সৌন্দর্যের যেমন শেষ নেই, হিমালয়ে হিন্দু তীর্থেরও তেমনি অন্ত নেই। অথচ আল্পসের দেশের লোকেরা এই শত-খানেক বছর আগেও জানত যে, পাহাড় হচ্ছে পৃথিবীর কুৎসিত কুঁজ, ওখানে দুষ্টশক্তি মানে দৈত্য-দানবের বাস। সম্প্রতি এই ইউরোপীয়দের কাছ থেকেই আমরা নতুন করে পর্বতারোহণের পাঠ নিয়েছি। উলট-পুরাণ আর কাকে বলে।

হিটলারের জার্মানিতেও পাহাড়ে যাবার মানেটা নিয়ে কোনরকম অস্পষ্টতা ছিল না। নাৎসীবাদের গৌরব বর্ধনের জন্য ওরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছে, ওই একই উদ্দেশ্যে ওরা হিমালয়েও এসেছে। তিরিশের দশকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নাঙ্গা পর্বতে যাকে বলে রিংসক্রীগ! পর্বতারোহণের পবিত্র বিধি-নিষেধগুলি অবজ্ঞা করে তখন গণ্ডায় গণ্ডায় জার্মান নিহত হয়েছে। আল্পস সমেত প্রায় সমগ্র ইউরোপ হিটলারের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, হিমালয় করেনি। অথচ ওই গর্বোদ্ধত জার্মানদের মধ্যে যে কটি খাঁটি জিনিষ ছিলেন—যেমন পল বাউয়ার, পিটার আউফ-টসনেইটার, হার্মান বুহল ইত্যাদি—হিমালয় তাদের প্রাপ্যের চাইতেও অনেক অনেক বেশি পুরস্কার দিতে কণামাত্র কুণ্ঠিত হয়নি।

বিশ ও ত্রিশ দশকে ব্রিটিশরা যে অত সমারোহ করে তিব্বত ঘুরে এভারেস্ট-এ আসত তারও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়ঢাক পেটানো। তার মানে কিন্তু এই নয় যে ওইসব অভিযানের পর্বতারোহীরা প্রত্যেকই ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী ছিল—তবে সেই ধ্বজা তাদের সবাইকেই বহন করতে হয়েছে। গোনাগুনতি দু-দশ জন যারা নিজেদের আনুগত্য হিমালয় ও সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগী করতে সম্মত হননি—যেমন স্মাইথ, শিপটন, টিলম্যান প্রমুখ—তারা স্বেচ্ছায় দলছুট হয়ে আপন আপন সাধনা সম্পন্ন করেছেন। এই দলছুটদের সাধনাতেই পর্বতারোহণের ঐতিহ্যটা গড়ে উঠেছে, সকলের চোখের আড়ালে আজও গড়ে উঠছে।

কিন্তু ঐতিহ্য তো অনেক পরের কথা—আমাদের জিজ্ঞাসা—মানুষ আদৌ পাহাড়ে যায় কেন? কেউ কেউ পাহাড়ে যায় ফিরে এসে জমকালো বই লিখবে বলে। এভারেস্ট শীর্ষ থেকে ঘুরে এসে তেনজিঙের বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, বড় চাকরি হয়েছে, এমনকি দ্বিতীয় একটি বউও হয়েছে। আমি একজনকে খুব অন্তরঙ্গভাবে জানি, পাহাড় থেকে ঘুরে এসে সে সাংবাদিক হয়ে গেছে! কিন্তু পরবর্তী-কালের এইসব হিসাবপত্র ঘেঁটে আমাদের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুন্দরের যে নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে এবং হিমালয় যে বাস্তবিকই খুব সুন্দর, সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই উদার সৌন্দর্যকে বসবার ঘরের শো-কেসে সাজিয়ে রাখবার উপায় নেই। তাকে ঝটিতি একবার চাক্ষুষ করবার জন্যে আজকের দিনের ছাঁট-কাট করা মানুষেরা এমন হন্যে হয়ে উঠবে—এটা বিশ্বাস করতে কেমন খটকা লাগে। ভগবানের রাজ্যে সবই নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু যারা সারাটা জীবন অসুন্দরের সঙ্গে নির্বিবাদে ঘর করবে বলে চুক্তিপত্রে সই করে বসে আছে, তারা হঠাৎ হঠাৎ সৌন্দর্যের পিপাসায় উতলা হয়ে পাহাড়ে ছুটবে—প্রকৃতির রাজ্যে এমন বৈসাদৃশ্য অধিকদিন চলতে পারে না। বায়ু পরিবর্তনের মতো নিছকই মেজাজ পরিবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে যারা হিমালয়ে গিয়ে থাকেন তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। পাহাড়ের প্রতি যাদের একটা প্যাশন আছে, পাহাড়ে কিছু দিন না যেতে পারলে যাদের দম বন্ধ হয়ে আসে, শহরের অফিসে থেকে যাদের ফেরারী আসামী বলে মনে হয়,—আমাদের জিজ্ঞাসা, পাহাড়ের জন্য তাদের এই উন্মাদনার উৎসটি কোথায়?

এক এক সময় সন্দেহ হয় যে, সাধারণ ভাবে প্রশ্নটির হয়তো কোন সর্বজনগ্রাহ্য জবাবই নেই। মানুষ দল বেঁধে কেন কালী-ঘাটের মন্দিরে যায়। চার্চে যায়। দীঘায় বা দার্জিলিঙে যায়, কোর্ট-কাচারিতে এবং বিদ্যালয়ে যায়—তা মোটামুটি বুঝে নিতে বা বুঝিয়ে দিতে বিশেষ অসুবিধে নেই। কিন্তু পাহাড়ে যাওয়াটা একটু ভিন্ন ধরনের ব্যাপার। এরাও দল বেঁধে পাহাড়ে যায় বটে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ দল না বেঁধে পাহাড়ে যাবার উপায় নেই—সে উপায় থাকলে পর্বতারোহণের চেহারাটাই ভিন্ন রকম হত।

পর্বতারোহীদের লেখা বই পড়েও আমাদের জিজ্ঞাসার স্পষ্ট কোন উত্তর পাবার আশা নেই। বইগুলিতে অনেক অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা আছে যা পড়তে পড়তে গা হিম হয়ে যায়। প্রায় হতচেতন হার্মান বুহল নাঙ্গা পর্বতের শীর্ষ থেকে রাত্রিবেলা একা একা ফিরে আসছেন,—একেবারে শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা। কিন্তু আদৌ কেন সেখানে যাওয়া হয়েছিল, বইয়ে তার কোন উল্লেখ নেই। পর্বতা-রোহণের অধিকাংশ বইতেই এ-প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র নেই। এমন হতেই পারে, খুব বড়ো কিছু একবার পেয়ে গেলে তখন জিনিসটা যে আদৌ কেন চেয়েছিলাম তা আর স্মরণ থাকে না; পাহাড়ে যাবার আগেও অনেক হিসাব-নিকাশ করতেই হয়, কিন্তু পাহাড়ে একবার পৌঁছে যেতে পারলে তখন লাভ-লোকসানের হিসাবটা সম্পূর্ণ তুচ্ছ হয়ে যায়। অতএব আমরা আবারও সেই অথৈ জলে!

তবে পর্বতারোহীদের লেখা পড়ে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে নগর জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হবার পরেই এরা একে একে পাহাড়ে এসে আশ্রয় নেয়। পাহাড়ের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ, প্রায় সকলের বেলায়ই, ঘটে নেহাৎ আকস্মিকভাবে। ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের সাধ ছিল পাইলট হবে। কিন্তু বিমানবাহিনী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বলল, কলজে বড় দুর্বল। স্মাইথ পরে এভারেস্টের ষষ্ঠ শিবিরে—সমুদ্রবক্ষ থেকে প্রায় আটাশ হাজার ফুট উঁচুতে—সেই দুর্বল কলজে নিয়ে উপর্যুপরি তিন রাত নিঃসঙ্গ কাটিয়েছে! পর্বতারোহীর কলজেও একটু খ্যাপাটে ধরনের হয়। কেউ হয়তো ছাত্র পড়াতে পড়াতে, কেউ হয়তো অফিস করতে করতে, কেউ হয়তো বারম্বার মানসিক হোঁচট খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে পাহাড়ে এসে পৌঁছেছে। তবে এদের পাহাড়ে আসার সাক্ষাৎ কারণগুলো যতই ব্যক্তিগত হোক সেগুলোর মধ্যে একটা সাধারন ধুয়া আছে। আর সেটি হোল, এক-কথায়, নগর-বিতৃষ্ণা।

পর্বতারোহণের ইতিহাসেই এর সমর্থন আছে। প্রয়াসটির জন্ম ইউরোপে। সেই ইউরোপ কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিশ্বাস করত যে পর্বতটা আসলে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানো ইত্যাদির স্থায়ী ঠিকানা। শতখানেক বছর আগে সাগর সম্পর্কে আমাদের সমাজে যেমন একটা বিরূপ ধারণা ছিল, ইউরোপেও তখন পাহাড় সম্পর্কে তেমনি বিরূপতা। তারপর ইউরোপীয় সভ্যতা যতই নগর-কেন্দ্রিক হয়ে উঠতে লাগল, পর্বত সম্পর্কে ইউরোপীয় ধারণাটাও ততই বদলে যেতে থাকল। গোড়ার দিকে একটু সঙ্কোচ ছিল, তাই পর্বতারোহণের দুঃসাহসিকতাটুকুর উপর

তখন খুব জোর দেওয়া হত, বলা হত, আজানাকে জয় করতে যাচ্ছি। এইটে ইউরোপের খুব প্রিয় স্লোগান। ইউরোপ পাহাড়কে স্বীকার করে নিল। তারপরে নগর-সভ্যতা জটিল হতে থাকল, পাহাড়ের প্রতি আকর্ষণও ততই জোরদার হতে থাকল। দুটো বিশ্ব যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর পর্বতারোহী জন্ম নিয়েছে—কেউ কেউ বলে, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের ওই একটাই যুক্তি বা জাস্টিফিকেশন।

প্রথম প্রথম ইউরোপীয় পর্বতারোহীরাও বিশ্বাস করত যে দুঃসাহসিক কিছু একটা করবার জন্যই তারা পাহাড়ে যায়। পাহাড়ের চূড়োয় একবার পদার্পণ করে এলে তারপর কত গৌরব, কত সম্বর্ধনা। কিন্তু আসল সত্যটা এই হিরণ্ময় আবরণে সম্পূর্ণ চাপা পড়ল না। জাতকাট পর্বতারোহীরা আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করল যে দুঃসাহস-ফুঃসাহস আসলে বাজে কথা। পাহাড়ের চূড়োয় পদার্পণ করা হোল-কি-হোল-না সেটাও অপ্রাসঙ্গিক। পাহাড়ে যাবার আসল কারণ, পাহাড়ে না গিয়ে থাকি না। পাহাড়ে এলে বুক ভরে দম নিতে পারি। পর্বতারোহণের আনন্দ ও চরিতার্থতা পাহাড়ে চড়বার সময়, চূড়োয় কোন গুপ্তধন নেই। পাহাড়ে এসে নিজের চাইতেও বড়ো কিছুকে প্রত্যক্ষ করি, সমীহ করতে শিখি, তাই পাহাড়ে আসি।

ব্যক্তিগতভাবে মাত্রই দু'জন ইউরোপীয় পর্বতারোহীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপের সুযোগ ঘটেছে। স্যার এডমাণ্ড হিলারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল গ্র্যাণ্ড হোটেলের একটা স্যুইটে —১৯৬০ সালে। ঘরময় কাগজ-পত্র ছড়ানো, সোফা কৌচগুলো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, দু'টো তিনটে স্যুটকেস হাঁ করে তাকিয়ে আছে, সুন্দরী একটি বউ সোফায় কোণে নিঃশব্দে হারিয়ে গেছে, আর সেই সুবিস্তীর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে কার্পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে এলো গায়ে স্যার এডমাণ্ড হিলারী খুব ব্যস্তভাবে খুব জরুরি কিছু একটা টাইপ করছেন। দেখলেই বোঝা যায় যে গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্যুইটে থাকবার সুবিন্যস্ত যোগ্যতা-এর একেবারেই নেই। এমন লোক পাহাড়ে গেলে হাড় জুড়োয়।

অন্নপূর্ণার সেই দুর্ধর্ষ ফরাসী পর্বতারোহী লায়োনেল টেরো-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি কোন সময়ে—গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের লাউঞ্জে। ভদ্রলোকের তখন চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হয়েছে। মাথায় চুল নেই বললেই হয়। পোষাক-আশাক বাহুল্য বর্জিত। নিতান্তই সাদামাটা চেহারা। এর সম্পর্কে যেসব দুর্ধর্ষ কাহিনী পড়া গেছে সে সবের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ আছে বলেই মনে হয় না। কিন্তু ওর চোখ দুটোর দিকে তাকালেই সব সংশয় দূর হয়ে যায়—অমন সুদূর প্রশান্ত চাউনি কেবল খাঁটি পর্বতারোহীর চোখেই সম্ভব। টেরো আমার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গেই কথা বলছিলেন, কিন্তু বারবারই মনে হচ্ছিল যে তার দৃষ্টিটা আমাকে ভেদ করে সুদূর কিছুর দিকে স্থির হয়ে আছে। ভদ্রলোক খুব কম কথা বলেন, অনেক থেমে থেমে,—অভিযানের উচ্চতর শিবিরে অক্সিজেন কম বলে পর্বতারোহীরা এমনি থেমে কথা বলে থাকে। ভাবটুকু প্রকাশের জন্য মুখ যতটুকু না-নাড়লে নয়। টেরোর সঙ্গে সেদিন টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে কথা হয়েছিল, নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে। কিন্তু সেদিন কথা বলা শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসবার পর কেমন যেন একটা অস্পষ্ট সংশয় হচ্ছিল: এতক্ষণ কি সত্যিই টেরোর সঙ্গে কথা বলে এলাম? সংশয়টা যে অমূলক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সংশয়টা তবু আজও পর্যন্ত থেকে গেছে। কুলীন পর্বতারোহীদের এই এক ধারা। শহরের দশজনের ভিড়ের মধ্যে ও নির্জন পাহাড়ের নিঃসঙ্গতা দিয়ে ঘেরা। এরা যখন পাহাড়ে যেতে পারে না, তখন পাহাড়কে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। পাহাড়ের জন্যই উৎসর্গীকৃত।

ঘটনাক্রমে কিছু কিছু ভারতীয় পর্বতারোহীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। এদের সম্পর্কে বিশেষ করে বলবার কিছু নেই। শুধু এটুকু উল্লেখ করতে হয় যে অন্য কোন লাইনেও এরা সমান সাফল্য অর্জন করত। তবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতি বছর যেসব ছোটখাট অভিযান বেরোয় সেগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু কিছু খাঁটি জিনিষ থাকে। এই সব অভিযানের খবর স্থানীয় কোন কাগজের ভিতরের পাতায় কচিৎ কখনো বেরোয় অথবা বেরোয় না। এই সব অভিযাত্রীদের সাফল্য অসাফল্য পরিচিত গণ্ডীর মধ্যেই কালে মিলিয়ে যায়। প্রায় সব সময়ই এরা পুরোপুরি বিকশিত হবার আগে ঝরে পড়ে। যেমন গৌরাঙ্গ সুন্দর চৌধুরী ১৯৬১ সনে আমাদের সঙ্গে মানা অভিযানে গিয়েছিল। তার বছর তিনেক পরেই বোম্বাইয়ের একটি দলের সঙ্গে গিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে হারিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে অমন পাহাড়-পাগল ছেলে আদৌ জন্মাবারই কথা নয়, ভুল শুধরে নিতেও বিলম্ব হয়নি। গৌরাঙ্গ নেহাতই ব্যতিক্রম। ওর ক্ষেত্রে এমন কথা বলা চলবে না যে, রেলের ভাড়ায় রেহাই মেলে বলে পাহাড়ে যায়।

সে যাই হোক, এতক্ষণে এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে প্রশ্নটির কোন স্পষ্ট জবাব নেই। মানুষ কেন পাহাড়ে যায়?—এই প্রশ্নের কোন সাধারণ, সর্বজনগ্রাহ্য জবাব হতেই পারে না। পাহাড়ের সঙ্গে পর্বতারোহীর সবসময়ই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এমনই গভীরভাবে ব্যক্তিগত যে স্বয়ং পর্বতারোহীই সবসময় ব্যাপারটা সঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অতএব মানুষ কেন পাহাড়ে যায়?—এই প্রশ্নের একমেবাদ্বিতীয়ম কোন জবাব নেই। কিন্তু জবাবদিহি আছে অজস্র —আজও পর্যন্ত যতজন পর্বতারোহী পর্বতের আশ্রয় নিয়েছে ঠিক ততগুলি জবাবদিহি আছে—কেন না, প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে পাহাড়ে যায়। রাম যে কারণে পাহাড়ে যায়, শ্যাম সে কারণে যায় না, যদু আর মধুরও ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে।

সুতরাং, মানুষ কেন পাহাড়ে যায়? আমাকে কেউ এই প্রশ্ন করলে তখন আমি নিজে কেন পাহাড়ে যাই সেটা যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিই। ঘটনাটি আজো স্পষ্ট মনে আছে। বি এ, এম এ পাশ দেবার পর, পুরো সাড়ে চার বছর বেকার জীবন যাপন করে, তার কিছুদিন মাত্র আগেই একটা চাকরি পেয়েছি। ভালো চাকরি, তখনকার দিনে আড়াই শ' টাকা মাইনে—ইচ্ছা করলে উপরির রাস্তাও আছে। কিন্তু দশটা পাঁচটা বজায় রাখতেই প্রাণান্ত হয়ে উঠলাম—তার উপর আবার সকলের সঙ্গে হেসে কথা কইতে হয়। এতসব যে তখন ঠিক বুঝতাম তা নয়, কিন্তু ভিতরের জলুনিটা যাবে কোথায়? জলুনিটা শান্ত রাখবার জন্য নগর সভ্যতায় যেসব বিধি-ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার দুটো-একটা ব্যবহার করে যেন হিতে বিপরীত হল। দুঃসহ জিনিষগুলো অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। সেই সময়ই একদিন, অফিসে গিয়ে চোখ তখনো জড়িয়ে আসছে, খবরের কাগজে কুণ্ডু স্পেশ্যালের একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল আড়াইশ' টাকায় কেদার-বদরি। এই বিজ্ঞাপন এর আগেও বহুবার চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই—কিন্তু এইবারে মেজাজটা ভালো ছিল না, তাই ঘটনা আরও একটু গড়ালো। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, সেই ১৯৫৫ সনেই, প্রায় দু'শ মাইল পথ হেঁটে, কেদার-বদরি ঘুরে এলাম। ব্যাস, বীজ বপন হয়ে গেল। তারপর থেকে সিজন এলেই পায়ের তলা চুলকোতে শুরু করে। সেই থেকে অদ্যাবধি হিমালয়ে যাওয়া আর আমার শেষ হোল না। হিমালয়ের বৈচিত্র্য একটু একটু করে যতই বুঝেছি, হিমালয়ের আকর্ষণও ততই নিবিড় হয়েছে। এই বৈচিত্র্যেরও শেষ নেই, এই আকর্ষণেরও শেষ নেই।

কিন্তু এতসব ব্যাখ্যা করে বলবার সময় কোথায়? বললে শুনবেই বা কে? তাই কেউ যখন জিজ্ঞেস করে যে বলতো পাহাড়ে কেন যাও? তখন আমিও দাঁত চেপে সংক্ষেপে জবাব দিই—পাহাড়টা আছে। অতএব যাই। 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার।'

স্বরাজ ঘোষ : এই সংখ্যা লিখতে গিয়েই আমার মনে পড়ে গেল, এখন তো ফুটবলের প্রি-সিজন চলছে। যে প্রি-সিজনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। আর যা লিখে ফেলেছি, তা পর্যালোচনা করব এই বলে যে, যাদের উদ্দেশ্যে লিখছি, তাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই সুন্দর শীতকাল, যেটাকে আমি প্রি-সিজন বলে অভিহিত করলাম, এই সময়ে সেই বিষয়গুলো অধিগত করার উদ্দেশ্যে যাতে তারা অনুশীলন করার সুযোগ গ্রহণ করেন। অনেকের কাছে হয়ত প্রি-সিজন অর্থাৎ ফুটবল খেলার মরসুম পূর্বকাল ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। কারণ আমাদের দেশে এখন সারা বছরই ফুটবল খেলা চলে। কাজেই প্রি-সিজন কথাটা বললে অনেকেই ধাঁধায় পড়েন। কিন্তু কয়েকবছর আগেও আমাদের দেশে সারা বছর ফুটবল খেলা হত না। তখন শীতকালে আমাদের দেশে ফুটবল খেলা হত না। এখন আমাদের দেশে প্রথমশ্রেণীর অনেক ফুটবল প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও সেই সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মাসে প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হয় ও বার মাসই খেলা চলে। কিন্তু আমরা সিজন বলতে গ্রীষ্মকালকেই বুঝি। একদিন এই বাংলাদেশের সরকারীভাবে ফুটবলের সময়কাল ছিল ১ মে থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর খেলা বন্ধ হয়ে যেত। যেটাকে ইংরেজিতে বলে সিজন ব্রেক। অর্থাৎ মরশুমকে ভেঙে দেওয়া। তার পরের পর্বটা বা কালটাকেই বলে প্রি-সিজন। এই সিস্টেমের যথার্থই গুরুত্ব ছিল। আজ এগুলো হয়ত আমাদের দেশে ইতিহাস হয়ে গেছে। কিন্তু বর্জিত হয়েছে কি? মোটেই নয়। বরং বলব, এদেশে বর্জিত করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের সব উন্নত দেশেই সিজন-ব্রেক আছে। এই কারণে যে, শরীর ও মনের বিশ্রাম, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও পরবর্তী মরশুমের জন্য প্রস্তুতি পর্বের স্বার্থে। সেই সমস্ত দেশের খেলোয়াড়রা সেই সময়কালে শরীরের অবস্থাকে বিশ্রামের মাধ্যমে স্বাভাবিক-ভাবে ফিরিয়ে আনিয়ে তারপর পরবর্তী প্রস্তুতির স্বার্থে আবার কর্মানুষ্ঠানে লেগে পড়েন। এর জন্য সেই সমস্ত দেশের খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য ও মন অটুট থাকে ও পরবর্তী কর্মপন্থার প্রতি উৎসাহ থাকে।

ফুটবল খেলতে হলে শক্তি, সামর্থ, গতি, তৎপরতা ও কঠিন মানসিকতার প্রয়োজন। কাজেই এই সমস্ত উপাদানগুলি অ্যাথলেটিক্স এর মধ্যেই আছে। তাই ফুটবল খেলতে হলে, অ্যাথলেটিক্স ফিটনেস ছাড়া ফুটবল খেলা যায় না, এই কথাটা আমি বারবারই উল্লেখ করেছি, আর উল্লেখ করেছি অ্যাথলেটিক্স-এর সঙ্গে ফুটবলের যোগ কোথায়? তা আবার ছবি দিয়ে বর্ণনাও করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে অ্যাথলেটিক্স-এর নিশ্চয়ই মূল্যায়ন হবেও অ্যাথলেটিক্স-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই সুন্দর শীতকাল অর্থাৎ প্রি-সিজন কালে অ্যাথলেটিক্স করা উচিত। আরও বলি, বিদেশের প্রি-সিজন কালে বৃষ্টি হয়। তাতে মাটি ভেজা থাকে। কাজেই অ্যাথলেটিক্স-এর কার্যকলাপগুলো 'শাস্ত্রীয়ভাবে' করা যায় না। এবং করলেও কোন ফল হয় না। অর্থাৎ নরম মাটির জন্য স্পিড, জাম্প ও স্পিডের এক্সলেরেশন হয় না। কাজেই মাটিকে শক্ত করার উদ্দেশ্যে রানিং ট্র্যাক, জাম্পিং রানওয়ে, থ্রোইং রানওয়ে ও



কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (২৫)

থ্রোইং সেন্টারে সিণ্ডার বা পাথরকুচি বিছিয়ে দেয়। সেই দিক থেকে আমাদের শীতকালে বৃষ্টি হয় না ও মাটি শক্ত থাকে। ফুটবলের স্বার্থে অ্যাথলেটিক্স কার্যকলাপ করার জন্য এই ধরনের মাটিই উপযুক্ত। তার উপর শীতের রোদ বড়ই মিষ্টি এবং শরীরের থেকে কম ঘাম বের হয় ও আবহাওয়াতে প্রচুর অক্সিজেন থাকে। শরীরকে খেলার জন্য উপযোগী করার উপযুক্ত সময় এই শীতকাল।

আমি লিখেছি কোচিং আর ট্রেনিং একই জিনিস নয়। খেলবার জন্যই ট্রেনিং। অর্থাৎ ফুটবল খেলা-পারিস্থিতির জন্য বিভিন্ন স্কিল, ট্যাকটিক্স, কৌশলগুলো শেখার উদ্দেশ্যেই ট্রেনিং। কাজেই এই ট্রেনিংগুলোর জন্য এই সময়টার সুযোগ নিতে হয়। আর কোচিং পর্ব হল, সিজন বা মরশুমের সময়। অর্থাৎ যুদ্ধ চলাকালীন সময় ও কিছু তার পূর্বে।

আমি কতকগুলো মৌলিক ব্যায়ামের ছবি দিয়ে লিখেছি। অনেকে হয়ত ভেবেছেন— কত রকমই তো শারীরিক অনুশীলন আছে, তবে কেন এই ব্যায়ামগুলো উল্লেখ করলাম। তার অর্থই হল, অ্যাথলেটিক্স ফিটনেসের জন্য যে সমস্ত ব্যায়ামগুলো প্রয়োজন হয় তার চেয়ে এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা। তবে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক আছে। আমি জানি, অ্যাথলেটিক্স করলে অন্যান্য ব্যায়ামগুলো করতেই হবে, যা সবিস্তারে লেখা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু যৌগিক ব্যায়ামগুলো উল্লেখ না করলে শরীর ও মনকে সংযমের পথে নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে। ফুটবল খেলা দম, সহনশীলতা ও শক্তি ভিন্ন হয় না। কাজেই শরীরকে বেঁধে রাখার জন্য সংযমের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। কতকগুলো খাদ্য ও যান্ত্রিক ব্যায়াম দ্বারা অতি দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়। কিন্তু মনের উন্নতি হয় না। কিন্তু সেই স্বাস্থ্য অসংযমের জন্য ভেঙে পড়তেও সময় নেবে না। কিন্তু অন্যান্য ব্যায়ামের সঙ্গে যৌগিক ব্যায়াম যোগ করলে তবেই স্বাস্থ্য অটুট থাকবে। বিশেষত কিশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সন্ধিক্ষণে বয়সটা বড়ই চিন্তা করার মত। সেই উদ্দেশ্যেই যৌগিক ব্যায়ামগুলো তুলে ধরেছি। তবে এও বলছি, কিশোর বয়সে যান্ত্রিক ব্যায়াম, বিশেষত আমাদের এই গরম দেশে, ফুটবল খেলার স্বার্থে না করাই ভাল।

বল কন্ট্রোলের ব্যাপারে আমি কয়েকটি বিষয় এখনও লিখিনি। যা পরবর্তী সংখ্যা-গুলোতে লিখব। আর যা লিখেছি তা অতি সংক্ষেপে। যেমন, এখনও পাসিং, হেডিং, ফিন্টিং, সুটিং, কর্নার কিকিং, চৌকিং এবং গোলকিপিং সম্বন্ধে লিখিনি।

আমি লিখেছি টোটাল ফুটবলার না হলে প্রকৃত গোলকিপার হওয়া যায় না। কাজেই লিখে যাচ্ছি, সেই সমস্ত বিষয়গুলো অনুধাবন ও উপলব্ধির স্বার্থে গোলকিপারের অনুশীলন করা উচিত। আমি আমার প্রস্তাবনায় এই গোলকিপিং ও আমাদের দেশের বর্তমান গোলকিপারের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছিলাম। সেদিন রূঢ় সত্য কথাটা অনেক গোলকিপার শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেননি। আমিও জানি গোলকিপাররা অপেক্ষা করছেন। প্রকৃত গোলকিপিং সম্বন্ধে কবে লিখব। তবে জানিয়ে দিচ্ছি টোটাল ফুটবলারের স্বার্থে গোলকিপাররা আমার লিখিত বিষয়গুলো একেবারে যেন উপেক্ষা না করেন। আমি এই পর্বটি শেষের পর্ব হিসাবে রেখেছি। যখন ছবি দিয়ে বর্ণনা করব, এমনকি খেলার পারিস্থিতির মুহূর্তগুলো তুলে ধরব, তখন বোঝা যাবে একটি গোলকিপারই একটি দলের কাণ্ডারী।

বল কন্ট্রোল পর্বের পর লিখতে শুরু করব গেম কণ্ডিশান ও গেম সিচুয়েশন ও তার বিভিন্ন অনুশীলনগুলো।

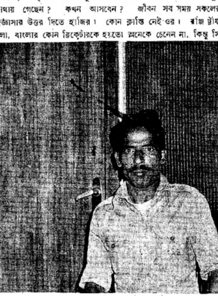
(চলবে)

সি এ বি-র জীবন

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ কালিঘাটে মহিম হালদার স্ট্রিটের গলিতে কয়েকটি ছোট খুপরি ঘর। মাটির দেওয়াল, উপরে টালি (গত বছরের প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টিতে ঘরের খাট অবধি জল উঠেছিল)। ঘরের দেওয়ালে মা টেরেসার ছবি এবং তার আশে পাশে আরও কয়েকটি যেমন একটি সোবার্সের সঙ্গে, অপরটি গাভাসকর ও সোলকারের মাঝখানে—এই ধরনের নানা ফটো। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ওগুলো টাঙানো রয়েছে। খাটের একপাশে একটা রেডিও। ঘরে ঢোকার পথে এক চিলতে জায়গা, সেখানেই ওর স্ত্রী রান্না করছে। ওর পরনে সেই পোশাক, যে পোশাকে সি এ বি-তে সকলে ওকে দেখতে অভ্যস্ত। বাড়িতে খুব বেশী সময়ের জন্য ও থাকে না। ওকে খোঁজ করতে হলে আপনাকে সোজা চলে আসতে হবে ইডেনের ক্লাব হাউসে। ওর নাম জীবন—জীবনলাল। জীবন সি এ বি-র 'জীবন'।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টেস্টের কয়েকদিন আগে ক্লাব হাউসে গেছি সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে। জরুরী মিটিংয়ে তখন তিনি ব্যস্ত। বাইরে অপেক্ষা করছি। মাত্র পাঁচ ফুট উচ্চতার ছোটখাটো শরীরটা নিয়ে জীবন সম্পাদকের ঘরের সামনে বিরাট আকৃতি নিয়ে দণ্ডায়মান। এমন সময় সি এ বি-র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কার্তিক সিংহ এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ঢুকে দরজার দিকে অঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—'যান, আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলাম। আমার আর কিছু করণীয় নেই। আপনার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে ও, অর্থাৎ জীবন।'

সি এ বি-তে এসে অনেক আগন্তুক প্রথমেই খোঁজ করেন জীবনকে। ধরা যাক—অমুকবাবু বললেন—জীবন, সম্পাদক কোথায়? তমুকবাবুর প্রশ্ন—এই জীবন, অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি চণ্ডীবাবু কি ঘরে আছেন? তৃতীয় ব্যক্তি শুধোলেন—জীবন, বলতে পারো—অমুক কোথায় গেছেন? কখন আসবেন? জীবন সব সময় সকলের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হাজির। কোন ক্লান্তি নেই ওর। রাঞ্জি ট্রফি খেলা, বাংলার কোন ক্রিকেটারকে হয়তো অনেকে চেনেন না, কিন্তু সি



সি এ বি-র সভাপতি ও সম্পাদকের ঘরের সামনে জীবন

এ বি-তে যাদের যাতায়াত, জীবনকে জানেন না—এমন লোক বিরল। নানা পেশার কত নামী ও প্রতিষ্ঠিত লোকের সঙ্গেই না ওর আলাপ। জীবনকে তারা স্নেহ করেন, ওর দরকারে সহায়তা দেন।

জীবনও অনেককেই চেনে। যে কোন ভি আই পি-কে দেখলেই ও বলে দিতে পারে, কি তার পরিচয়। কর্ণাটক বা অন্য কোন রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদকের নাম কি, কিম্বা চিন্নাস্বামী বা গোলাম আমেদই বা কোন্ জন, জীবন এক নজরে তা বলে দিতে পারে। তাদের মধ্যে অনেকেও জীবনের সন্ধান করেন। ও যেন সি এ বি-র রোড ডাইরেক্টরি।

টেস্টের আগের ক'দিন এবং টেস্ট চলাকালীন সম্পাদক, সহঃ সম্পাদকের মত জীবনেরও নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না। ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে রাত এগারোটায়। টেস্ট যত নিকটবর্তী হয়, সেক্রেটারির ঘরের সামনে ওকে সামলাতে হয় ভিড়ের স্রোত। যতক্ষণ সম্পাদক সি এ বি থেকে না বেরোন, জীবনকেও আটকে থাকতে হয় তার সঙ্গে। টেস্টের সময় জীবন-হীন ক্লাব হাউস কল্পনা করা যায় না।

জীবন কি শুধুই সি এ বি-র সামান্য কর্মচারী? না, ও আরও কিছু।

★

৬৩-৬৪ সিরিজে ভারত-ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্টের আসর বসবে কলকাতায় জানুয়ারির শেষদিকে। ইংল্যাণ্ডের প্রথিতযশা ব্যাটসম্যান ও প্রাক্তন ক্যাপ্টেন কলিন কাউড্রে প্রথমে দলের সঙ্গে আসেননি। কিন্তু তৃতীয় টেস্টের আগে তিনি কলকাতায় পৌঁছে গেছেন পরের তিনটি টেস্টে খেলবেন বলে। এখানে এসেই ইডেনে তিনি প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। এবং নেটে তার অনুশীলনের সময় দারুণ উত্তেজনা ও চমক সৃষ্টি করল জীবন। ওর ইনসুইংয়ে কাউড্রে দুবার বোল্ড হয়ে গেলেন। এবং জীবনের বোলিং দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে কলিন কাউড্রে শুধু ওকে প্রশংসাই করলেন না, নিজে সই করে একটি পাঁচ টাকার নোটও উপহার দিলেন। এর চেয়ে দামী পুরস্কার সারা জীবনে জীবন খুব কমই পেয়েছে। পরদিন অধিকাংশ সংবাদপত্রে সেই খবর প্রকাশিত হল। ছবিও বেরোলো—কাউড্রে জীবনের হাতে পাঁচ টাকার নোট তুলে দিচ্ছেন।

কেবল কাউড্রেই নন—সোবার্স, বেনো, জন রিড, সেমুর নার্স, বেসিল বুচার প্রমুখ অনেক নামী ব্যাটসম্যানই জীবনের হাতে আউট হয়েছেন নানা সময়ে। ইডেনে বিভিন্ন দেশের যত বিখ্যাত ক্রিকেটার খেলে গেছেন, তাদের প্রায় সকলের অটোগ্রাফ ওর কাছে অতি সযত্নে রক্ষিত। ঘরে প্রবীর সেন, পঙ্কজ রায় থেকে শুরু করে পতৌদি, হাজারে, দাত্ত, ফাদকার, মুস্তাক মহম্মদ, মুস্তাক আলীদের যেমন, তেমনি বাইরের ট্রুম্যান, বেডসার, ব্রায়ান, ক্লোজ, গিবস, কোলি স্মিথ, বোর নাইট, প্রমুখ সবার নজরই জীবন কেড়ে নিয়েছে। ইডেনে ঘটে যাওয়া ক্রিকেটের অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী এই জীবন। সোবার্স, বেনো'রাও বুট, ব্যাট প্রমুখ নানা সামগ্রী ওকে উপহার দিয়ে গেছেন।

জীবনের দুঃখ—ও কোনোদিন স্বীকৃত ক্রিকেটের আসরে খেলতে পারেনি। কিন্তু, অনেকেই হয়তো খবর রাখেন না, জীবন ডিভিসনে ফুটবল খেলেছে—দু'বছর স্পোর্টিং ইউনিয়নে এবং পরের দু'বছর জর্জ টেলিগ্রাফে। অত্যন্ত আদরের সঙ্গে রক্ষা করা খেলোয়াড় জীবনের কাটিংগুলো জীবন দেখিয়েছে।

সুদূর কেন্ট থেকে কাউড্রে ওকে চিঠি লিখেছেন, তেমনি ফুটবলার কিট্রর প্রশংসা-পত্রও ওর কাছে রয়েছে। রয়েছে শৈলেন মান্না, রমণী সরকার প্রমুখ আরও অনেক গুণী মানুষের সার্টিফিকেট। জীবনের কাছে এইসব সংবাদপত্র, অটোগ্রাফ, বা সোবার্স, কাউড্রে,

জীবন এই দীর্ঘ সময়ে দেশ-বিদেশের অনেক নামী ক্যাপ্টেনকে কাছ থেকে দেখেছে। এবং তাদের মধ্যে ওর অন্তরে সবচেয়ে দাগ কেটেছেন মনসুর আলী পতৌদি। জীবনের বক্তব্য—'নীচের মানুষ, মানে আমাদের সম্পর্কে তার ধারণা চমৎকার এবং কি সুন্দর আচরণ ভাবতে পারবেন না।' এখনকার ক্যাপ্টেন গাভাসকরও ওকে আলাদা চোখে দেখেন। সানির জন্য জীবন গর্ববোধ করে, বলে—'নাউ হি ইজ দ্য বেস্ট ওপেনিং ব্যাটসম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।'

হ্যাঁ, জীবন এখন বেশ ভালো ইংরেজী বলতে শিখেছে, নানা ক্রিকেটার ও গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে। অথচ স্কুলে পড়বার সুযোগ ওর কোনোদিনই হয়নি। কিন্তু তবু, এরমধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বেশ কয়েকটি ভাষা আয়ত্তে এনে ফেলেছে ও। আর ইংরেজীটা মাঝে মাঝেই কথা বলার ফাঁকে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

জীবন বিয়ে করেছে ৭৩-এর ১৩ জুন। মাইনে অল্প ছিল, তাই বিয়ে করার ইচ্ছে তখন ওর ছিল না। কিন্তু নতু কোলে এবং সি এ বি-র আরও অনেকেই বললেন—'বিয়ে কর, আমরা আছি।' জীবন বিয়ে করল বারুইপুরের গরীব ঘরের মেয়ে অল্পনাকে। বিয়ের পর এক সময় ওকে খুব কষ্ট করে দিন কাটাতে হয়েছে। এখন কিছুটা লাঘব হলেও পুরোপুরি হয়নি। নিজের জমি, বসত বাড়ি বলতে কিছুই ওর নেই। ৭৪ সালে একটি মেয়ে হয়েছে। ওর ভবিষ্যতও পড়ে আছে। ছোট খুপরি ঘরে বসে এসব ভাবনা যখন মনে ভিড় করে আসে, স্পষ্টতই জীবনের কপালের চিন্তার ভাঁজ দেখা যায়। একমাত্র যতক্ষণ সি এ বি-তে থাকে, এইসব বাস্তব চিন্তা থেকে ততক্ষণ ও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। সি এ বি বা ইডেন ওর রক্তের ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে।

বিভিন্ন সময়ে দেখা নানা বিখ্যাত ক্রিকেটারের মধ্যে সোবার্স এবং অবশ্যই কলিন কাউড্রেকে ও কখনো ভুলতে পারবে না। তাদের প্রশংসা করতে গিয়ে ওর গলায় আবেগ এসে জড়ো হয় এবং ঝরঝর করে ইংরেজী বলতে থাকে ও। আর বাংলার ক্রিকেটারদের কথা উঠলেই খোকন সেনের নাম করতে গিয়ে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে জীবন। বলে যায়—তার দয়া, ভালোবাসা এবং স্নেহের কথা।



জীবন পাল—আই জি সুনীল চৌধুরী ও বংশী মহান্তির মাঝখানে

পরবর্তীকালের অম্বর রায় এবং এখনকার রাজু মুখার্জিও ওর মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছে। আগে পঙ্কজ রায় বা এখন দাত্তু ফাদকারের কাছে সময় পেলেই ও নিঃসঙ্কোচে বাংলার দু-একজন ক্রিকেটার সম্পর্কে জোর তদ্বির করে।

আর একজনের, বংশীর প্রতিও, ওর শ্রদ্ধা অপরিসীম। জীবনের কথায়—'নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সেরা গ্রাউণ্ডসম্যান। ইডেনের পিচকে তার মত আর কেউ বুঝে খায়নি। পিচ সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অগাধ। আমি কর্মেরও প্রেরণা পাই তার কাছ থেকেই।' বছর দুয়েক আগে বংশী মালী সকলকে ছেড়ে চলে গেছেন। সে সময় তার ছেলে নটোবর মহান্তি এখানে ছিল না। তাই, ভাগ্নে নকুলের সঙ্গে জীবন সমেত আরও কয়েকজন মালী তার মুখাগ্নি করেছিল। বংশী সম্পর্কে ওর শেষ কথা—'সর্বোপরি তিনি একজন গুণী মানুষ ছিলেন।

জীবনের এখন একটাই বড় আশা—নিজের চোখে বাংলার রঞ্জি ট্রফি জয় ও দেখে যেতে চায়। কারণ, শুধু সি এ বি-কেই নয়, বাংলাকে—বাংলার ক্রিকেটকে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

জীবন ইডেনে হয়ে যাওয়া অনেক টেস্টের সাক্ষী। ওর চোখের সামনে ঘটেছে ইডেনে ভারতের প্রথম জয়, বিরাট পরাজয়, আবার ও চাক্ষুস করেছে অনেক ড্র—নীরস এবং নাটকীয়, দুরকমই।

৫৮-র ৩১ ডিসেম্বর জীবন দেখেছে রোহন কানহাইয়ের দুর্দান্ত ও চোখ ঝলসানো ব্যাটিং-তাণ্ডব। দেখেছে ও'নীল, সোবার্স, সিম্পসন, জন রিড, সাটক্লিফ, হানিফ মহম্মদ, পতৌদি, বিশ্বনাথ, গাভাসকরদের ব্যাট হাতে রান ছড়াতে, সেঞ্চুরি করতে।

ও যেমন রোমাঞ্চিত হয়ে দেখেছে ট্রুম্যান, গিলক্রিস্ট, লিণ্ডওয়াল, হল, গ্রিফিথ, ফজল মামুদ, ম্যাকেঞ্জি, রমাকান্ত দেশাইয়ের দুরন্ত ফাস্ট বোলিং, তেমন বেনো, গুলাম আমেদ, গিবস, ভ্যালেন্টাইন, গুপ্তে, দুরানী এবং বেদী, চন্দ্র, প্রসন্ন, ভেঙ্কটদের স্পিন চাতুর্য। অনেক অবিশ্বাস্য ফিল্ডিং-ক্রিয়াও ঘটে গেছে ওর দৃষ্টির সামনে।

জীবনদের নিয়ে লেখা হয় না। ওরা চিরকাল অন্তরালের বাসিন্দাই থেকে যায়, হয়তো থাকতে চায়। অথচ জীবনের 'জীবন', নিঃসন্দেহে একটা শ্বাসরুদ্ধকারী উপন্যাসের মতই জীবন্ত ও উদ্দীপক।





সুনীল গাভাসকর ও একনাথ সোলকারের মাঝে জীবনলাল

দ্বাদশ ব্যক্তি সন্দীপ পাতিল

প্রদীপ বিজয়কর : নেটের মতো ম্যাচেও কজন ব্যাটসম্যান ব্যাট করে থাকেন ? যতজনই করুন না কেন সন্দীপ পাতিল এমনই একজন ব্যাটসম্যান যিনি নেট প্র্যাকটিস আর ম্যাচে কোনো পার্থক্য বোধ করেন না। অবশ্য তার এই গুণ ক্রিকেট জীবন বিকাশের পথে কার্যতঃ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জাতীয় টুর্নামেন্ট-গুলিতে সন্দীপের রান ৩০ থেকে ৪০-এ সীমাবদ্ধ থাকতো ওই বেপরোয়া ব্যাটিং-এর জন্য। ক্রমে তিনি ব্যাটসম্যান অপেক্ষা সীম



বোলার হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হলেন। গতবছর জীবনের বাইশটি বসন্ত পার হয়ে আসার পর ঝড়ের মতো বোম্বাই-র ক্রিকেট আসরে নিজের স্থান করে নিয়েছেন সন্দীপ।

স্থানীয় ক্রিকেটে তার প্রথম স্বীকৃতি 'ফ্রিক' বোলার হিসেবে। তার ডেলিভারি দেখে বোঝা যেত না বল কোনদিকে যাবে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে 'শক' বোলার হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগলো যাতে রানের গতি রোখা যায় অথবা ওভারের হার বজায় রাখা যায়। মিডিয়াম পেস বোলার হিসেবে তাকে কাজে লাগানো হল না।

কিন্তু ১৯৭৬ সালে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে বোম্বাই-এর অধিনায়ক অশোক মাঁকড় সন্দীপকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের প্রথম রঞ্জি ম্যাচে তাই তিনি ৪৯.৪ ওভার বল করেন, উইকেটও পান। কিন্তু কোন রান করতে পারেননি। এর ফলে মাঝে মধ্যে দু'একটি ম্যাচে সুযোগ পেতেন মাত্র। গত বছর মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমেদনগরে ৫৯ নট আউট করার পর থেকে তিনি রঞ্জিতে বোম্বাই দলে অপরিহার্য। এই ম্যাচে সালগাওকরের একটি বল গ্যালারিতে পাঠিয়ে বেপরোয়া ব্যাটিং-এর স্বাক্ষর রাখেন সন্দীপ। পরে কোয়ার্টার ফাইনালে সেই ব্যাটিং-এর পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ভাল রান না পাওয়ায় তার যেন শিক্ষা হলো। সেমিফাইনালে দিল্লির বিরুদ্ধে মুন্সীয়ানার সঙ্গে ব্যাট করে সন্দীপ সেঞ্চুরি পান (১৪৫)। সেই ম্যাচে দলের বর্ষীয়ান অভিজ্ঞরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরের ম্যাচেই উইল্‌স্‌ ট্রফিতে উইল্‌স্‌ একাদশের হয়ে আবার সেঞ্চুরি (১০১)। এরপর টাইমস অব ইণ্ডিয়া শিল্ড টাটা স্পোর্টস-এর হয়ে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি সহ মোট ৭৫১ রান। টাটা এই শিল্ড জেতে প্রধানত তারই কৃতিত্বে।

এই ম্যাচগুলো যারা দেখেননি তারা বলতে পারেন, মাঠগুলো ছোট ছিল তাই…। কিন্তু তাদের একথা স্মরণ করাতে চাই, পাতিলের স্বচ্ছন্দ মারগুলি কোনক্রমে সীমানা পার হয়নি, বহুক্ষেত্রে বল মাঠসীমানা ছাড়িয়ে রেললাইনে পড়েছে অথবা সাগরের জলে হারিয়ে গেছে। টাইমস অব ইণ্ডিয়া টুর্নামেন্টের ফাইনালে ৯০-এর ঘরে গিয়ে সন্দীপ ধীরাজ পারসানার বলে মিড উইকেট দিয়ে বিশাল ছক্কা মেরেছেন। তার আর একটি ছয় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ছাদে পড়েছে। তার একটি ডাবল সেঞ্চুরি আগের ছ'বারের চ্যাম্পিয়ন মফৎলালের বিরুদ্ধে করা। মফৎলালই হচ্ছে ওই টুর্নামেন্টে সর্বাধিক তারকামণ্ডিত দল। প্রত্যেকটি ইনিংসে সন্দীপের অভিজ্ঞতা বেড়েছে এটা প্রমাণ হয়েছে। তার চমকপ্রদ মারগুলি তাকে পরিপূর্ণ ব্যাটসম্যানের সম্মান এনে দিয়েছে।

এই টুর্নামেন্টে তার দর্শনীয় মার দেখে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক নরি কণ্ট্রাক্টর বলেন, 'ভারতীয় দলে যদি কেউ এর থেকে সময়মতো ব্যাট চালাতে জেনে থাকে, তবে ভারতে ব্যাটিং প্রতিভা প্রভূত সৃষ্টি হচ্ছে বোঝা যাবে।'

সাম্প্রতিক ইংল্যাণ্ড সফরের প্রথম দিকে ভারতীয় ব্যাটিং নিশ্চিতভাবে টেমস নদীর জলে আগুন জ্বালাতে পারেনি। তবু ভারতীয় দলে সন্দীপের ডাক পড়েনি। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতীয় দলে সন্দীপের অন্তর্ভূক্তি কেন হয়নি ? নির্বাচকদের মনোভাব সত্যিই বোঝা ভার। এমনকি দলীপ ট্রফি ফাইনালে পর্যন্ত সন্দীপ পশ্চিমাঞ্চল দলে ঢুকতে পারেননি। ইংল্যাণ্ড সফরের আগে ৬১ জনকে বোর্ডের চুক্তিপত্রে সই করানো হয়। কিন্তু সন্দীপ তারমধ্যে পড়েননি। এটাই হচ্ছে, আমাদের প্রতিভা খুঁজে বার করার অনেক নজিরের একটি !

কিন্তু ভাগ্যদেবী বড়ই চতুরা। তিনি এক হাতে নেন, অন্য হাতে দেন। তাই এখানে নির্বাচিত না হলেও টেস্ট ক্রিকেটার রাজ সিং-এর আনুকূল্যে সন্দীপ ইংল্যাণ্ড গেলেন এডমণ্টন ক্লাবে খেলতে। মিডলসেক্স লিগে বোলার হিসেবে নিজেকে তেমন প্রকাশ করতে না পারলেও তার মারগুলিতে কব্জির জোর, লংঅন দিয়ে তার ড্রাইভগুলির চকিতে সীমানা পার হওয়া অনেকেরই উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। ওখানে জন স্নোর মতো একজন চমৎকার বোলারের অধীনে সন্দীপ তার সুইং আরও নিখুঁত করতে পেয়েছেন। নিয়মিত কিছু উইকেটও পেয়েছেন।

দেশে ফিরে তিনি তার রুইয়া কলেজের সহপাঠিনী আম্পনাকে বিয়ে করতে দেরি করেননি। তারপরই মনোযোগ দিয়েছেন কি করে ভারতীয় দলে নির্বাচিত হওয়া যায়। কিন্তু এদেশে প্রতিভা থাকলেই দলে ঢোকা যায় না।

দিল্লির অরুণলাল প্রথম ম্যাচ থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'রিজার্ভ' খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় টেস্ট দলে ঢুকেছিলেন। ষষ্ঠ টেস্ট পর্যন্ত রিজার্ভই রয়ে গেলেন। অস্ট্রে-লিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট হওয়ার পরে সন্দীপ পাতিল ভারতীয় দলে 'রিজার্ভ' হলেন। অবশ্য তার আগে আমেদাবাদে তিনি পশ্চিমা-ঞ্চলের হয়ে সাধারণ ব্যাটিং করার পর 'টেস্ট-ক্যাপ' পান। অবশ্যই সে ম্যাচে কোনো নির্বাচকই হাজির ছিলেন না।

এখন সন্দীপ দ্বাদশ ব্যক্তি। কিন্তু চূড়ান্ত দলে ঠাঁই পেতে তার অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। কাকে সরিয়ে তাকে জায়গা করে দেওয়া হবে ? তবে তাকে একটি সুযোগ দেওয়া উচিত যে মূল্যেই হোক না কেন :—এটা সবাই চায়।

চিঠিপত্র কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। মনে রাখবেন দু'পৃষ্ঠায় লেখা চিঠি ছাপান সম্ভব নাও হতে পারে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবেন না, চিঠি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখবেন। গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কোন বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠকের কলমে' উল্লেখ করবেন। তা না হলে ওই চিঠি সময়মত পাওয়া যায় না।



ডুরাণ্ড ফুটবল বিজয়ী মোহনবাগান

ছবি : শ্রেণীক শেঠ

ডুরাণ্ড ফাইনালে মোহনবাগান-পাঞ্জাব পুলিশের খেলায় শ্যাম থাপার পায়ে বল

রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডী ডুরাণ্ড কাপ দিচ্ছেন মোহনবাগানকে



সংবাদ চিত্র

ডুরাণ্ড ফাইনাল





ক্যাপ্টেন নলিনীমোহন গুপ্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনালে অশংগ্রহণকারী মিলন সমিতি / সিদ্ধার্থ সেন

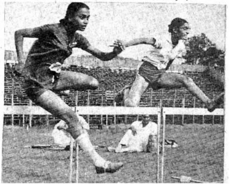


লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে অ্যাথলিট মল্লিকা দাসকে বৃত্তির টাকা তুলে দিচ্ছেন লায়ন্স ক্লাবের জেলা কনভেনর অরুণ গুপ্ত/ শঙ্কর নাগ দাস

কাহাড়ের নলিনী মোহন গুপ্ত টুর্নামেন্টের যুগ্ম বিজয়ী বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ / সিদ্ধার্থ সেন



এরিয়ান ক্লাবের বাৎসরিক স্পোর্টসে মেয়েদের হার্ডলস দৌড়/অরুণ মুখার্জি



সত্তরের দশকে কি হয়েছে, কি হয়নি

[দুটি ওলিম্পিক, তিনটি এশিয়ান গেমস, হকি অ্যাথলেটিক্স আর ক্রিকেট বিশ্বকাপ, দেশে বিদেশে আমাদের চোদ্দটা টেস্ট সিরিজ, এশিয়ায় বেশ কিছু মাঝারি ও ছোট ফুটবল প্রতিযোগিতা আর অন্যান্য অনেক কিছু পিছনে রেখে সত্তরের দশক শেষ হতে চলল। কি করেছি আমরা এই দশ বছরে, কি করা হয়নি অথবা করার মত সামর্থটুকুও ছিল না আমাদের তার বিস্তৃত ব্যাখ্যান নয়। ধারাবাহিক এই রচনায় লেখক দেখছেন জয়, সাফল্য, সম্মান এই শব্দগুলোর চেয়ে ব্যর্থতা, পরাজয় ভুল তথা নোংরামি এই শব্দ কটি কি ভয়ঙ্করভাবে আমাদের অনুসরণ করে চলেছে খেলাধূলার সালতামামিতে। এবার প্রথম কিস্তি।]

অয়ন বসু ঃ ষাটের দশকের শেষ দলটি যেদিন হারিয়ে গিয়েছিল, ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে নতুন এক দশকের চৌকাঠে পা রাখার উত্তেজনার মাঝে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কিনা কাউকে ভারতীয় খেলাধূলার সালতামামিতে দাঁড়িয়ে এর চেয়ে অবান্তর প্রশ্ন আর কিছু নেই এই মুহূর্তে। স্বাধীনতার পর থেকে ২৩ বছরে দুনিয়ার মানচিত্রে আমাদের আয়তন কিভাবে হ্রাস পেয়েছে জ্যামিতির দ্বারস্থ না হয়েও তা বলে দেওয়া যায়। কেন এই অধঃপতন তা জানাও অসম্পূর্ণ থাকেনি। স্বভাবতই স্বপ্ন যদি বা থেকে থাকে—ছিল সংশয়, সন্দেহ এবং চিন্তার দ্বন্দ্বও। এই দুয়ের সংঘাতের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে গেল যেন এই দশটা বছর।

ক্রিকেটের কথাই আগে। যেহেতু, সত্তরের দশকের আরম্ভে দুনিয়ার ক্রিকেট মানচিত্রে আমাদের আকৃতি হঠাৎই বিশাল হয়ে পড়তে শুরু করেছিল অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংল্যাণ্ডে অজিত ওয়াদেকারের দল টেস্ট সিরিজ জয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে নবজাগরণের ঢেউ লেগেছিল অবশ্যই। সত্তরের দশকের একেবারে শেষেও যার রেশ অনুভব করা যাচ্ছে।

একথা ঠিক নেতিবাচক ক্রিকেটের মোহ যে আমরা চিরকালের মতই ত্যাগ করতে পেরেছি এই দশকই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সবচেয়ে বড় পাওয়া যেমন গাভাসকর তেমনি বিশ্বনাথের ব্যাটসম্যান হিসেবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ক্রিকেটকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছে অবশ্যই। তবু কি একথা বলা অন্যায় হবে এই দশকে ক্রিকেটে যতটা প্রভাব ছড়ানো



অজিত ওয়াদেকার

উচিত ছিল আমরা তা পারিনি। কপিল-দেবের আগমনের আগে পর্যন্ত 'পেস বোলিং' শব্দ দুটো ক্রিকেট কর্তাদের বিবেককে বিন্দুমাত্র খোঁচা দিতে পারেনি। শুধু স্পিনারদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এগিয়ে চলার নীতিতে এতই আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা, যে প্রসন্ন-বেদী-চন্দ্রশেখর বা ভেঙ্কটের সার্থক বিকল্প খুঁজে পাবার কথাটাও মনে রাখার দরকার প্রয়োজন মনে হয়নি তাদের।

যে পদ্ধতি বা নীতি অনুসৃত হয়েছে এই দশকে টেস্ট ম্যাচ খেলার সময় ভুল তাতেও কিছু কম ছিল কি? পরিভাষার 'এ্যাপ্রোচ টু দ্য গেম' নিয়েও আমরা কতটুকু ভেবেছি তাতে সন্দেহ আছে। ভাল রানের পুঁজি জোগাড় হয়ে যাবার পরেও মিডল অর্ডারে এমন ব্যাটসম্যানের সংখ্যা খুব কম ছিল না যাদের ডিফেন্সিভ ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। রান পাওয়া এবং সেই সুবাদে দলে থাকাটা যে খেলার চেয়ে বড় নয় ক্রিকেটারদের মস্তকে এই কথাটা যথার্থভাবে প্রবেশ করানোর চেষ্টা ক্রিকেট বোর্ডকে প্রলুব্ধ করেনি কদাপি।

উইলস ট্রফির খেলা চালু করে ক্রিকেট বোর্ড একদিনের মেয়াদী ওভারের খেলায় ক্রিকেটারদের রপ্ত করানোর সদিচ্ছার পিছনে দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। কিন্তু বছরে দিনকয়েক নমো নমো করে এই ধরনের খেলা দিয়ে লাভ কিছুই হচ্ছে না ক্রিকেটের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ সেই শিক্ষা দিয়ে গেছে ভারতকে। আসলে বিশ্বকাপে খেলার জন্য যে মানসিকতা দরকার, যে প্রকরণ ও বৈভব থাকা দরকার আমাদের তা নেই।

এই দশকে ক্রিকেটে সাফল্য হঠাৎই এসে পড়েছে ঠিকই কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারিনি আমরা। সেটা সম্ভব হলে সত্তরের দশককে ভারতীয় ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যাত করা যেত।

সত্তরের দশকে দুটি ওলিম্পিকের দিকে তাকালে খেলাধূলায় আমাদের অবস্থাটা বোধ হয় জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯২৮ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে এগারোটি ওলিম্পিকে আমাদের মোট পদক সংগৃহীত হয়েছে এগারোটি। যার দশটি হকি থেকে এবং বাকীটি আঠাশ বছর আগে হেলসিঙ্কিতে ফ্রি-স্টাইল কুস্তিতে কে যাদবের পাওয়া।

বাহাত্তরের মিউনিখ ওলিম্পিকে হকিতে একটি ব্রোঞ্জ জুটেছিল আমাদের, ছিয়াত্তরে মন্ট্রিয়লে তাও জোটেনি। হকি ছাড়া ওলিম্পিকে আমাদের আর কোনো পরিচয়ই বড় হয়ে ওঠেনি কোনকালে। সত্তরের দশকে সেই পরিচয়টুকুও হারিয়ে গেছে।

কেন এমন হল? কেন এই অতলান্ত ব্যর্থতার মাঝে তলিয়ে যাওয়া? শুধু আমরা কেন দুনিয়ার কেউ কোথাও বুঝিতে এর ব্যাখ্যা পেয়েছে? বাহাত্তরে আমাদের তৃতীয় স্থান দখল একটা কথা জানান দিয়েছিল শুধু পাকিস্তান নয় হল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি বা



গাভাসকর

নিউজিল্যাণ্ডও আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছে। এবং ওই দেশগুলির চ্যালেঞ্জ বড় হয়ে উঠতে দেরী লাগবে না।

১৯৭৩-এ প্রথম বিশ্বকাপ হকির ফাইনালে হল্যাণ্ডের কাছে হেরে যাওয়া তার একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ মাত্র। কিন্তু ৭৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বকাপ হকিতে আমরা চ্যাম্পিয়ন হবার পর সব আকাঙ্ক্ষাই কি ভ্রান্ত মনে হয়নি? পরের বছর রেনে-ফ্রাঙ্ক হকিতেও বিজয়ী হয় ভারত অনেক পশ্চিমী দেশের অনুপস্থিতিতে।

কিন্তু তারপর? বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার পরিণতিই মণ্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে পাওয়া গেছে। আসলে হকিতে পাকিস্তানের পাশাপাশি তথাকথিত 'সুপার পাওয়ার' বলতে যে পশ্চিমী দেশগুলির কথা বলা হচ্ছিল তাদের সম্পর্কে আমাদের নিস্পৃহতা যে কতবড় বোকামি এই দশকে সেটা ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

হকি ফেডারেশনের উচ্চস্তরে রাজনীতি ও নোংরামির প্রত্যক্ষ প্রভাব খেলোয়াড়দের ওপরও এসে পড়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে কোচিং ক্যাম্প বা ওলিম্পিকের আগে অনুশীলন ব্যাপারগুলো অর্থহীন তথা ব্যক্তিগত মনোমালিন্য সৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে যায়। কোচ হিসেবে যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও যা জিজ্ঞেস করা যায় তা হল কিভাবে তারা দলকে তৈরি করা উচিত সেটা কি আদৌ জানতেন? যে শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে বিদেশী দলগুলি হকি খেলে আমাদের তা নেই। এটা জেনেও পশ্চিমী দেশগুলির অনুকরণে হকি খেলার চেষ্টা আমাদের কোন স্বর্গে ঠেলে দিয়েছে আজ। নিজস্ব ধারায় খেলার চেষ্টা ভারত বড় একটা করেনি। এবং তা করলেও অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি বা হল্যাণ্ডের পক্ষে তার মোকাবিলা আদৌ কষ্টের হয়নি।

এই দশকে দুনিয়াকে হতভম্ব করে দিয়ে থাকে যদি কিছু তবে সেটা হল পঁচাত্তরের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নের অবিশ্বাস্য পদস্খলন মাত্র মাস কয়েকের মধ্যে ছিয়াত্তরের মণ্ট্রিয়লে।

হকি যে এদেশে এখন এক ব্যবসা এই উলঙ্গ সত্যটুকুও কি বড় বেশি প্রকাশ হয়ে পড়েনি এই দশকে? বিভেদ-অন্তর্দ্বন্দ্ব-নোংরামি বস্তুগুলোর সঙ্গে ভারতীয় খেলাধূলার সখ্যতা অনেককালের। হকির প্রতি আকর্ষণ এগুলোর একটু বেশিই।

ওলিম্পিক অ্যাথলেটিক্সে পদক পাওয়া এই দশকেও হয়নি আমাদের। শুধু এক মণ্ট্রিয়লে আটশ মিটারে শ্রীরাম সিং ফাইনালে সপ্তম এবং ম্যারাথনে শিবনাথ সিং একাদশ স্থান পেয়েছিলেন। তাদের সক্ষমতা স্বীকৃতি হয়েছিল সেদিন। শুধু জানা যায়নি কোটি কোটি লোকের এই দেশে ওলিম্পিক অ্যাথলেটিক্সে পদক পাওয়ার মত অ্যাথলিট কেন সৃষ্টি হল না এই দশকেও? মিলখা সিং-এর সেই অবিস্মরণীয় দৌড়ের স্মৃতিমন্থন আর কতকাল একমাত্র সম্বল হয়ে থাকবে আমাদের?

এইসব 'কেন'র উত্তর একটাই। অ্যাথলেটিক্স আজও দুয়োরানী হয়ে আছে পৃথিবীর এই মুল্লুকে। আমাদের খেলাধূলার কর্তাব্যক্তিরা খেলাধূলার আদিম এই বস্তুটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না কোনদিন, আজও নেই। একথা ঠিক ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস এমনকি হকিতেও আজ এদেশে যে আধা পেশাদারী বা গোপন পেশাদারী ব্যবস্থা চালু হয়েছে অ্যাথলিটদের কপালে তার শিকে ছেঁড়েনি।

ছিঁড়লে ভাল হত এমন নয় তবু এটা অস্বীকার করা যাবে কোন উপায়ে যে একজন অ্যাথলিটকে বিশ্ব পর্যায়ে পৌঁছতে হলে যে ধরনের ট্র্যাক, দৌড়ের বা অন্য সরঞ্জাম, ট্রেনিং তথা তার ভবিষ্যত নিরাপত্তার দরকার হয় তার কোনোটাই আমরা দিই না। ওলিম্পিক তথা বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার একতরফা প্রাধান্যে চিড় ধরতে শুরু করেছে এই দশকেই। পূর্ব জার্মানির উঠে আসা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে তা জানার চেষ্টাও এদেশের খেলাধূলার প্রশাসকদের আদৌ নেই। যদি থাকত তবে তারা এটুকু জেনে অন্তত নিশ্চিন্ত হতেন আর যাইহোক আলাদীনের প্রদীপ ট্যাঁকে গুঁজে পূর্ব-জার্মান দল আন্তর্জাতিক আসরে হাজির হয় না।



কপিলদেব



বিশ্বনাথ

সেদেশে ১৬ বছরের অনূর্দ্ধ্বদের স্কুলে খেলাধূলা ও শারীর-শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে আছে সব খেলার উপযোগী খেলোয়াড় তৈরি করার পরিকল্পনা।

বলবীর সিং একদা বলেছিলেন, এদেশে স্পোর্টসম্যানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করা হয়। এর চেয়ে নোংরা সত্যি কথা আর কারো জানা আছে?

এই দশকের গোড়ার দিকে 'লিঙ্ক' পত্রিকা কৃত অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল দেশের শতকরা ১০০ ভাগ লোকই চান খেলাধূলার উন্নতি হোক। কিন্তু কিভাবে? 'ক্যাচ দেম ইয়ং-এর' সেই বহুশ্রুত বুলি আউড়ে এগোতে চাইলে প্রথমেই যেখানে হোঁচট খেতে হবে তা হল শতকরা আশিটা স্কুলের খেলার মাঠ বা ক্রীড়া-শিক্ষক বলে কিছু নেই।

নেই মানসিকতাও। খেলাধূলা মানেই সময় নষ্ট—এই সর্বনাশা চিন্তার দাসত্ব করছি আমরা বহুকাল। সত্তরের দশকেও তা থেকে বিচ্যুত হয়নি দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই। শিক্ষার জন্য ব্যয় করায় কার্পণ্য হন না সাধ্য থাকলে, কিন্তু সাধ্য থাকলেও ছেলেমেয়ের খেলাধূলার উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করতে আগ্রহী নন অভিভাবকেরা। একথা ঠিক উপযুক্ত শিক্ষা যেমন সন্তানের ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, তেমনি খেলাধূলায় সময় বা অর্থব্যয়ও যে কোনো হঠকারী কাজ নয় এ শিক্ষাটুকুই সম্পূর্ণ হয়নি আজও। ●

চলবে

নেহরু হকিতে নিচু মানের খেলা বাড়ছে, কমছে দর্শক

নয়াদিল্লি থেকে সুরেশ কৌশিক : পঁচিশ দিন ধরে হয়ে যাওয়া (১৪ নভেম্বর—৮ ডিসেম্বর) নেহরু হকি টুর্নামেণ্টে দেশের ৩২টি সুপ্রতিষ্ঠিত দলের লড়াই-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্স (সি আর পি এফ), দিল্লি।

তিন সপ্তাহের বেশি সময়ের এই টুর্নামেন্টে উন্নতমানের খেলা দেখা গেল না, সম্ভবত বিভিন্ন দল থেকে ভাল খেলোয়াড়দের অনেকেই পাতিয়ালায় ওলিম্পিক কোচিং ক্যাম্পে থাকায়। এজন্যে টিমগুলিকে ভুগতেও হয়েছে। যেমন, গতবারের বিজয়ী বি এস এফ (জলন্ধর), পাঞ্জাব পুলিশ, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। সবই ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কল্যাণে। ফেডারেশন বিধান দিয়েছে, পাতিয়ালার জাতীয় শিবিরে যারা আছেন সেই খেলোয়াড়রা নিজ নিজ টিমের হয়ে ওই সময় টুর্নামেণ্টে খেলতে যেতে পারবেন না।

জাতীয় স্বার্থ সব সময়ই প্রথম এবং প্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু উদ্যোক্তাদের হাজারো অনুরোধ সত্ত্বেও ফেডারেশনের নামে একটি টিমকে পাঠানো হল না। অবশ্য কিছু খেলোয়াড় শিবির চলাকালে টুর্নামেণ্ট খেলতে গররাজি ছিলেন আঘাত পাবার আশংকায়। শিবিরটি টুর্নামেণ্টের আগে বা পরে করলে ভালো হতো। তবে এদেশে এমনটিই ঘটে। ফুটবল বা অন্যত্র—সর্বত্র।

এটা তো একটা দিক। অন্যদিকে এবারের নেহরু হকি টুর্নামেণ্টে কার্যত 'পাওয়ার হকি'র রাজত্ব ছিল। উৎকর্ষ ও শৈলী এদেশের হকি থেকে ক্রমেই বিদায় নিচ্ছে। বলের ওপর স্টিকের খবরদারি এবং তাতে চমৎকৃত হওয়া সবই অতীতের ঘটনা। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করা ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভুলে যাচ্ছেন। এবারের টুর্নামেণ্টে সামান্য কয়েকটি গোল হয়েছে পেনাল্টি কর্নার থেকে।

সি আর পি এফ এই প্রথম 'উইনার্স' হলো। এই দলটি দ্বিতীয় রাউণ্ডে 'বাই' পেয়েছে। এর থেকে উপরে যারা সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যে গত দু'বারের বিজয়ী বি এস এফ-কে তারা হারিয়েছে। ফাইনাল সহ পরপর পাঁচদিন তারা ম্যাচ খেলেছে কোন বিশ্রাম ছাড়াই। অথবা বি এস এফ-এর সঙ্গে সমস্ত বিভাগে তারা সমান তালে খেলে শেষ পর্যন্ত কিস্তিমাত্ করেছে।

গত কয়েক বছর ধরে নিয়ান সিং সি আর পি-র কোচ. দলে স্টার খেলোয়াড় তেমন কেউ নেই। কিন্তু টিম ওয়ার্ক, সমঝোতা দারুণ। আর রয়েছে চোস্ত শরীর, দম, মনোবল, একাগ্রতা। উইং হাফ হাবুল বুজুর দলের কর্ণধার। গোলে গুরুং অপরাজেয়। সাইমন টপনো ব্যাকে 'চীনের প্রাচীর'। সেণ্টার-হাফ পরমোদ ও ফরোয়ার্ড খান্নি সিং প্রতিপক্ষকে কাঁপিয়েছে সব সময়। দলটিতে ভালো স্কোরার না থাকলেও অনরবত আক্রমণে তারা শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগকে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য বি এস এফ-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন মনেরাখার মতো জয়সূচক গোলটি করে লেফট আউট পত্র'স চমৎকৃত করেছেন।

আসলে সি আর পি এফ সেমিফাইনালেই যেতে পারতো না যদি না টুর্নামেণ্ট কমিটি রেজিমেণ্ট অব আর্টিলারি বনাম বি এস এফ কোয়ার্টার ফাইনাল লিগ ম্যাচটি ফলাফলসহ পুনরানুষ্ঠানের নির্দেশ না দিত। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ওই ম্যাচটি প্রথমে ড্র হয়। এই ফলাফল থাকলে সি আর পি এফ-এর বদলে অন্য দুটি দল সেমিফাইনালে যেত। কিন্তু দর্শকদের তীব্র প্রতিবাদের পর 'রিপ্লে' হয় এবং শেষ পর্যন্ত বি এস এফ জেতে এবং সি আর পি এফ-কে নিয়ে সেমিফাইনালে যায়।

বি এস এফ দলের দুজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় সেণ্টার হাফ অজিতপাল সিং ও চরণজিৎ কুমার পাতিয়ালা ক্যাম্পে থাকায় দল দুর্বল ছিল। এর থেকেও খারাপ অবস্থা ছিল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দলের। তাদের অর্ধেকের বেশি নিয়মিত খেলোয়াড় পাতিয়ালায়, অশোককুমার বাবা ধ্যানচাঁদের অসুস্থতার জন্য মানসিকভাবে খেলার জন্যে অপ্রস্তুত ছিলেন।

টুর্নামেণ্ট চলতে চলতে হকির যাদুকর অসুস্থ ধ্যানচাঁদের চিকিৎসার জন্য একটি 'বেনিফিট ম্যাচ' হয় এবং ২০ হাজার টাকা ওই কিংবদন্তীর নায়কের জন্যে সংগৃহীত হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।

সেমিফাইনালে সি আর পি এফ ২-০ গোলে কোর অব সিগন্যালকে (জলন্ধর) হারায় এবং বি এস এফ হারায় ৩-১ গোলে ওয়েস্টার্ন রেলকে (বোম্বাই)। ফাইনালেও বি এস এফ-এর বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি করেন সি আর পি এফ উইং ফরোয়ার্ড পত্র'স।

টুর্নামেণ্টে সব থেকে হতাশ করেছেন, সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের তরুণরা। আর দর্শক হয়েছে সামান্যই।

রাউরকেল্লায় দুটো ফুটবল স্টেডিয়ামই পড়ে থাকে

রাউরকেল্লা থেকে তরুণ ঘোষ : ওড়িশার বৃহত্তম শিল্পনগরী এই রাউরকেল্লায় দু' দুটো স্টেডিয়াম রয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের হলেও সত্যি তা ব্যবহার করার মতো ফুটবলারের এখানে ভীষণ অভাব।

আগে এখানে একটি সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেণ্ট (হরিহর মেমোরিয়াল ট্রফি) হতো। গত দু'বছর যাবত এখানকার ফুটবল নিয়ামক সংস্থার কল্যাণে তাও বন্ধ। কেন বন্ধ হয়েছে সে সম্পর্কে সংস্থার কর্মকর্তারা কখনই মুখ খুলতে চান না। অথচ স্থানীয় লোক ভীষণ ফুটবল-প্রেমী। বাইরের কোন দল প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে এলে ইস্পাত স্টেডিয়ামে দর্শক উপচে পড়ে। পাহাড় ঘেরা স্টেডিয়ামে বিদঘুটে গরমে সকাল থেকে সিদ্ধ হওয়া ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মানুষগুলি উল্লাসে ফেটে পড়েন ভালো খেলা দেখে। টিকিটের দাম পঞ্চাশ টাকা হলেও স্টেডিয়ামে আসন শূন্য থাকে না।

তাই টাকা-পয়সা কোন সমস্যা নয়। আসলে কর্মকর্তাদের দলাদলি ও কোন্দলই এখানকার ফুটবলের বিকাশ সাধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাউরকেল্লা প্রকল্পের দল আন্তঃইস্পাত ফুটবলে সাফল্য পাচ্ছে না কেন জানতে চাইলে কর্মকর্তারা বোবা হয়ে থাকেন, প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে যান। অনেকের কাছে প্রশ্নগুলি বিরক্তি উৎপাদন করে মাত্র!

আগ্রহ এবং সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও রাউরকেল্লার ফুটবল এগোয়নি। বিগত কয়েক বছর ধরে আন্তঃইস্পাত প্রকল্প ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই রাউরকেল্লা ইস্পাত প্রকল্প জয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। খেলে আসছে নমঃ নমঃ করে, কিন্তু কেন? কারণ উঠতি খেলোয়াড়দের অভাব।

কলকাতায় তো মোহন-ইস্টের লড়াইয়ে যেমন বাঙালী দু-ভাগ হয়ে যায় একই পরিবারে, একই পাড়ায়, রাউরকেল্লায় তেমনটি ঘটে না। মাঝে মাঝে যখন প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয় তখনই বোঝা যায় যে, রাউরকেল্লার দর্শকরা ফুটবলকে কতটা ভালবাসেন। স্থানীয় ইস্পাত স্টেডিয়ামের চার কোনা থেকে সব মানুষের উল্লাস আছড়ে পড়ে একসঙ্গে একটি দলকে ঘিরেই। অদ্ভুতভাবে সবাই এক হয়ে যান। এমনটা ঘটে স্থানীয় কোন ভাল ফুটবল দল নেই বলেই। অথচ রাউরকেল্লার মানুষজন ভাল ফুটবল দেখার জন্য উদগ্রীব।

হরিহর মেমোরিয়াল টুর্নামেণ্ট থেকে বেশ কিছু ভাল খেলোয়াড় বাছাই করে আগে জাতীয় ফুটবলের জন্য ওড়িশা দল নির্বাচন করা হতো।

জাতীয় যোগাসনে বাংলা সবার উপরে

শবাসনে রাজশ্রী চক্রবর্তী / শংকর নাগ দাস



স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'ছেলেবেলায় ও খুব পেটের রোগে ভুগত। সবসময় শরীর খারাপ।' কেদারনাথ চক্রবর্তী মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—'এখন কিন্তু ওর কোন রোগ বালাই নেই।' মেয়ে রাজশ্রী ছোটবেলার কথায় একটু যেন লজ্জা পেল। তবে এখন যে সে নীরোগ সেকথা জোর দিয়েই বলল।

প্রধানত পেটের রোগ থেকে রেহাই পেতেই রাজশ্রী আসন অভ্যাস শুরু করে। 'চার পাঁচ বয়স থেকেই ও আসন করছে।' যোগাসনে রাজ্য,জাতীয় বেশ কিছু সম্মানের অধিকারী রাজশ্রীর ঝোঁক আছে অ্যাথ-লেটিক্সেও। রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ও ক্যাডবেরী স্পোর্টসের মত প্রতিযোগিতা থেকেও বেশ কয়েকটি পুরস্কার এনেছে। ওর দুটোই ভাল লাগে। আর ভাল লাগে কবিতা আবৃত্তি করতে। যোগাসন ছেড়ে দেবে একথা ভাবতে পারে না। 'তবে এবছর পাশ করলে ভাবছি, একটু ঢিলে দেওয়াব, কারণ ফাইনাল ইয়ার তো'—রাজশ্রীর বাবা বললেন।

১৪ বছর ৭ মাস বয়স রাজশ্রীর। সুন্দর স্বাস্থ্য, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের (রাজাবাজার) ক্লাস নাইনের ছাত্রী এই মেয়েটিই এবার বাঙ্গালোর থেকে পঞ্চম জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় (বি গ্রুপে) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ওর অর্জিত পয়েন্ট ১৩৫.৫। ওর গ্রুপে দ্বিতীয় হয়েছে ইতি শর্মা (১৩১) ও তৃতীয় কর্ণাটকের এস সি মিনা (১২৯.৫)। বাংলার উজ্জ্বলা সরকার (১৮ থেকে ২২ বছর গ্রুপে) ১৩০.৫ পয়েন্টে প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় দেবশ্রী দত্তও (১২৮.৫) বাংলার মেয়ে।

ছোট মেয়েদের (এ গ্রুপে) মধ্যে প্রথম হয়েছে মালতিকা দাস (৭৩.৭৫), দ্বিতীয় কর্ণাটকের মেয়ে সি বি প্রতিভা, তৃতীয় বাংলার মেয়ে চৈতালী ভট্টাচার্য।

বড়দের গ্রুপে প্রথম তিনটি স্থান পেয়েছে বাংলার ললিতা পোলে (১২৮.৫), বুলু দেব (১২১.৫) ও শান্তি অধিকারী (১১১.৪)।

বাংলার মেয়েদের মধ্যে মহিলা যোগ-ব্যায়াম কেন্দ্রেরই পাঁচজন মেয়ে—চৈতালী, রাজশ্রী, শান্তি, বুলু ও শীলা রায়। শীলা 'সি' গ্রুপে হয়েছে পঞ্চম। বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির উজ্জ্বলা সরকার ও ইতি শর্মা পুরস্কার পেয়েছে। তবে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে রাজশ্রী। সমস্ত মেয়ে প্রতিযোগীর মধ্যে ওর অর্জিত পয়েন্টই সবচেয়ে বেশি।

মেয়েদের মতো না হলেও ছেলেদের বিভাগেও পশ্চিমবঙ্গের জয়জয়কার। গ্রুপ এ'র সেরা সুমন চৌধুরী ও সৈকৎ রায় (তৃতীয়) এবং গ্রুপ সি'র প্রথম তিনজন অসীম ঘোষাল, দীপক কুণ্ডু ও সুবীর রায় পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। গ্রুপ বি'র সোমনাথ সাহাও (তৃতীয়) এ রাজ্যের ছেলে। গ্রুপ এ'তে দ্বিতীয় হয়েছে বিহারের বিশ্বজিৎ কর।

কর্ণাটকের পক্ষে সোনা পায় রবি প্রকাশ (১২-১৮ বছর গ্রুপ) ও গোপাল কৃষ্ণ (২২ বছরের ঊর্ধ্বে)।

চূড়ান্ত ফলে দেখা যায় এবার সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ১০৪ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন ও কর্ণাটক ৪৯ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স হয়। ●

বহরমপুরে সাঁতার

বহরমপুরের প্রতিনিধি ঃ অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১২-১৪) বহরমপুর সুইমিং ক্লাবের জলক্রীড়া প্রতিযোগিতা ক্লাবের নিজস্ব পুলে অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর বন্যার দরুন দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতি-যোগিতা করা সম্ভব হয়নি।

এবারের প্রতিযোগিতা দুভাগে বিভক্ত ছিল। একটি শুধুমাত্র ক্লাবের সদস্য ও সদস্যাদের জন্য এবং অপরটি সকল প্রতি-যোগীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। দুটি বিভাগের মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা ৯০।

সকল প্রতিযোগীদের জন্য উন্মুক্ত বিভিন্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েদের জন্য ১০০, ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল, ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক, ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই ও ৪×১০০ মিটার রিলে রেসের ব্যবস্থা ছিল। কাশিমবাজার ওয়াই এম-এর নিরঞ্জন দেবনাথ, রামপ্রসাদ আগরওয়ালা, মিণ্টু সরকার, শিপ্রা দত্ত, অনিতা ঘোষ, সঞ্জীব সরকার, সেবা মিলনীর (খাগড়া) প্রশান্ত প্রামাণিক এবং বহরমপুর সুইমিং ক্লাবের পীর মহম্মদ ও অনিমা রজক সাফল্য লাভ করেন।

বিভিন্ন গ্রুপে ক্লাবের প্রতিযোগীদের জন্য ২৫ ও ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইল ও ব্যাক স্ট্রোক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। সন্দীপ বসু, সুপর্ণা রায়, বৈশাখী ঘোষ ও অরুণ প্রকাশ রজক পুরস্কার পান।

ক্লাবের কোচ শক্তিপদ রজক (এ আই এস) সাঁতারের বিজ্ঞান সম্মত নিয়ম কানুনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমীর ব্যানার্জি জীবন রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি দেখান। মহিলা সদস্যাদের 'ওয়াটার ব্যালে' এবং একটি প্রদর্শনী ওয়াটারপোলো ম্যাচ বহরমপুরের দর্শকদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।

আন্তঃকলেজ ফুটবলে কৃষ্ণনগর কলেজ বিজয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি নদীয়া জেলা চতুর্থ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হল। নক আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় মাত্র পাঁচটি কলেজ অংশগ্রহণ করে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ ৪-৩ গোলে কৃষ্ণনগর কমার্স কলেজকে হারিয়ে দেয়।

নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকার ফলে অতিরিক্ত সময়ের খেলার সুযোগও তারা সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। শেষে টাইব্রেকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ ২ ও কমার্স কলেজ ১ গোল দেয়।

এই খেলার অন্যান্য ফলাফল ঃ ক) কৃষ্ণ-নগর কমার্স কলেজ (২) ঃ বেতাই আম্বেদকর কলেজ (০), খ) কৃষ্ণনগর কমার্স কলেজ (২) ঃ শান্তিপুর কলেজ (১), গ) কৃষ্ণনগর কলেজ (ওয়াক ওভার) ঃ বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ।

পাঠকের কলমে

এশিয়ান গেমস ভারতেই হোক

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী চান্ না যে ভারতবর্ষে এশিয়ান গেমস হোক। খরচা প্রচুর। আমাদের গরীবের দেশে ওই টাকা দিয়ে অনেক কাজে লাগবে। রাজস্থানের খাল কাটা হবে, তা থেকে আমাদের দেশের অনেক গরীব ভাই বাঁচবে, খুবই ভাল প্রস্তাব। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ৪৫ কোটি (সরকারী) টাকা খরচায় কোনই দরকার ছিল না। রাজস্থানের মতো অনেক কাটা খালই কাটা হয়ে যেত ওই টাকায়।

ভোটের ফায়দা লোটার কথা ছেড়ে দিয়ে, যাতে নির্বিঘ্নে এশিয়ান গেমস ভারতের বুকেই



অনুষ্ঠিত হয়, সেই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মৈত্রী যাতে সুদৃঢ় হয় তার চেষ্টা করলে অনেক ভাল হবে। দেশবাসীও আপনাকে ভুল না বুঝে ভালবাসবে।

কিন্তু, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রশ্ন, কেন আপনি আড়াই বছরের মধ্যেই আপনার দলকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন? আপনার জন্যেই তো লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ডাক দিলেন রাষ্ট্রপতি। আপনি যদি একটু গরীবদের কথা চিন্তা করে থাকতেন, তা হলে

অরুণ, বরুণ হালদার,
গোলাবাড়ী, বর্ধমান।

তথ্যগত ভুল

আমি খেলার আসরের নিয়মিত পাঠক। গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৯-র খেলার আসরের ১০-এর পাতায় 'পি কে কেমন অবসর নেবেন' রচনায় একটি তথ্যগত ভুল লক্ষ্য করলাম। রচনাটির স্পেকুলেশন অংশের ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফে লেখক লিখেছেন, 'কলকাতায় গত পাঁচ বছরের লিগ-শিল্ডের আসরে ইস্ট-বেঙ্গল কোনওবার জয়ী হতে পারেনি।' এখানে আমার বক্তব্য লেখক কি না জেনে এরকম তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি কি ১৯৭৫ সালের লিগ-বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ও শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের ৫ গোলের রেকর্ড বেমালুম ভুলে গেলেন। অথবা তিনি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেলেন। ১৯৭৬-এ শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে লিগ বিজয় করে ইস্টবেঙ্গল। লেখক কি এগুলি পাঁচ বছর আগের বলতে চাইছেন। অথবা তিনি হিসাবেই ভুল করে ফেলেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে তিনি এইরূপ ভুল তথ্য পরিবেশন করে পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবেন না।

শ্যামল মিত্র
শীতল খুচী, কোচবিহার।

ত্রুটি স্বীকার

'পি কে কেমন অবসর নেবেন' লেখাটিতে একটি মারাত্মক ভুল থেকে গেছে। একটি লাইনেই—'কলকাতায় গত পাঁচ বছরের লিগ-শিল্ডের আসরে ইস্টবেঙ্গল কোনওবার জয়ী হতে পারেনি' এটা ভুল। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম কলকাতায় পরপর পাঁচটি লিগ-শিল্ডের আসরের কথা।

—মেঘনাদ

আশ্রয় চাই

আমি একজন অনাথ ছাত্র। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করবার পর অনাথ আশ্রমের আশ্রয় হারাই, মামা বাড়িতে আশ্রয় পেলেও আজ সেই আশ্রয় থেকেও বিতাড়িত। আমি এখন আশ্রয়হীন। বহু কষ্ট করে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি, দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ছি। ফুটবল খেলি, গোলকিপার। ১৯৭৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সুব্রত কাপে এন সি সি দলের হয়ে খেলি। বড় ইচ্ছা ফুটবলার হবার। খুব কম বয়সে মা-বাবাকে হারাই—আজ আর কেউ নেই। ফুটবল অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি প্রদ্যোৎ পাটা গুপ্তর কাছে, ময়দানে। কিন্তু জানি না ক'দিন চলবে, ক'দিন চালাতে পারব।

তাই খেলার আসরের সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন—আপনারা কেউ আমাকে আশ্রয় দিন। আমাকে বাঁচতে দিন। আপনারা যদি কেউ আমাকে আশ্রয় না দেন, তাহলে আমার স্বপ্ন, আমি নিজে, কেউ বাঁচব না। আমাকে কেউ যদি সন্তানের মত, ভাই-এর মত একটু আশ্রয় দেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

শ্যামল দে, ১২, স্টেট ব্যাঙ্ক গার্ডেন
(ঠাকুরপুকুর), কলকাতা-৬০।

ফুটবলও চাই না

বেশ কিছুদিন ধরে ক্রিকেট খেলার বিরুদ্ধে ফুটবল অনুরাগীদের মনোভাব পাঠকের কলমে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং ক্রিকেট অনুরাগীরা তার বিরোধিতা করছেন। কিন্তু এর অর্থ কী? তবে কি বুঝব ফুটবলের অনুরাগীরা অপর জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটকে ভারতের বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে ফুটবলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান? কিন্তু ফুটবল অনুরাগীরা এই কথা মনে করে লজ্জিত হবেন যে, ফুটবলের তুলনায় ক্রিকেট ভারতকে অনেক কিছু দিয়েছে। বিশ্বের ক্রিকেট অনুরাগীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন পতৌদি, গুপ্তে, ওয়াদেকার প্রমুখ খেলোয়াড়দের। স্পিনের যাদুকর চন্দ্র, বেদী প্রভৃতি খেলোয়াড়রা বিশ্বের বিস্ময়। গাভাসকর, বিশ্বনাথ সারা পৃথিবীর ক্রিকেট অনুরাগীদের সম্মান আদায় করেছেন।

কিন্তু ফুটবল ভারতকে কি দিয়েছে? ভারত প্রমাণ করেছে, ক্রিকেট রাজার খেলা নয়, খেলার রাজা। সেই হেতু সহাবস্থান নীতিটিই গ্রহণযোগ্য, তাই কি না?

জয়ন্ত সরকার, পিপুলপাতি, হুগলী।

(২)

ক্রিকেটে 'সময়ের অপচয়' হয়, এই অজুহাতে যদি তা বন্ধের দাবী উঠতে পারে, তবে 'সমাজ দূষিত' করার অভিযোগে ফুটবল বন্ধ হবে না কেন?

ক্রিকেট শিক্ষা দেয় ধৈর্য আর সংযম। কিন্তু বর্তমানে এদেশের ফুটবল থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই, যার জন্য ফুটবলকে আদর্শ করতে পারবো?

টিম, টিঙ্কু বসু ও রঙ্কু রায়।
বর্ধমান।

একটি অনুযোগ

ডুরাণ্ড কাপ জয়ী মোহনবাগান দিল্লির ফুটবল-প্রেমীদের খুবই দুঃখ দিয়েছে। তাদের হাতে কাপটি তুলে দেবার পর দর্শকরা মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের কাপ হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করার বহু অনুরোধ জানায়। কিন্তু খেলোয়াড়েরা দর্শকদের অনুরোধ উপেক্ষা করে মাঠের বাইরে চলে যান। শুনেছি কলকাতায় দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর খেলোয়াড়রা ট্রফি ও পতাকা হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন। কলকাতায় যা করা যায়, দিল্লিতে তা যায় না কেন?

সমীত গুহ,
সরোজিনীনগর, নতুন দিল্লি

মক্কায় কেন মস্তানি

কয়েক মাস আগে বোম্বেতে টাটা স্পোর্টস বনাম মফতলাল দলের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট নিলাম ও মসৃণভাবে মাঠে ঢুকে খেলা দেখলাম। ওখানে পুলিশ কিছু হলেই নির্দোষ জনতার উপর লাঠিচার্জ করে না বা মাঠের ভিতর জনতা ইঁটের টুকরো বর্ষণ করে না। বোম্বেতে পুলিশ সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়িয়ে লাইনের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখে ও জনতা উত্তেজিত হলেও রেফারিকে ও প্লেয়ারদের তাড়া করা বা মাঠে খেলা চলাকালীন ইঁট ফেলে না। তাই আমার অনুরোধ, এই ব্যবস্থা কি কলকাতাতে হতে পারে না। খেলার মক্কা আনন্দের স্থানে এইরূপ মস্তানি চললে ভারতের ফুটবলের মক্কা নামের সার্থকতা কি?

শুভজিৎ মুখার্জি, ৬/৩ গুরুনানক রোড,
দুর্গাপুর-৫।

ধ্যানচাঁদের উদ্দেশ্যে আলির অসাধারণ কার্টুন

১৪ ডিসেম্বরের খেলার আসরে সপ্তম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আলির আঁকা অসাধারণ কার্টুনটি দেখে মুগ্ধ হলাম। এই কার্টুনটিতে শিল্পীর চিন্তার গভীরতা এবং মর্মস্পর্শী শ্রদ্ধার উজ্জ্বল নিদর্শন ফুটে উঠেছে। বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট আলি আমাদের এই বিশাল দেশের মানুষের পক্ষ থেকে ভারতীয় মানচিত্রের শূন্যস্থানে একটি পুষ্পস্তবক ও হকির স্টিক অর্পণ করে প্রয়াত ধ্যানচাঁদের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, তা সত্যিই বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অসাধারণ এই কার্টুনটি উপহার দেওয়ার জন্য খেলার আসরের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কাজী আরিফুল ইসলাম,
পোঃ-খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

মানচিত্রে ভুল

খেলার আসর ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সংখ্যার ৭ পাতায় কার্টুনিস্ট আলি যে চিত্র এঁকে অনন্তলোকবাসী ধ্যানচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সেটা কোন্ ভারতবর্ষের ছবি? ছবিতে ভারতের গুজরাট প্রদেশকে ভারতের পূর্বদিকে দেখান হয়েছে! এই রকম মানচিত্র আঁকার উদ্দেশ্য কী? দয়া করে জানাবেন।

মোহনচাঁদ আঢ্য, শেওড়াফুলি।

(১৪ ডিসেম্বর তারিখে (৭ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত আলির কার্টুনটি মুদ্রণ প্রমাদে (অফসেট) উল্টে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। মানচিত্র আঁকা ঠিকই ছিল।
—সম্পাদক।)

সুরজিতের বিদেশ যাত্রা

২৭.১১.৭৯ তারিখে 'সুরজিত বিদেশমুখী' প্রসঙ্গটি পড়ে সুরজিতের একজন অন্ধ সমর্থক হিসাবে আমি যেমন ব্যথিত হয়েছি, তেমনি সংবাদটি পড়ে আনন্দও পেয়েছি কম না। আজ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষাগত এবং খেলাধূলার ক্ষেত্রেও এই ঐতিহ্যশালী ভারতবর্ষ যেভাবে রাজনীতির নাগপাশে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে তা নিতান্তই লজ্জাকর। আজ কিছু পুঁজিপতি গোষ্ঠের মানুষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রাজনীতি যে পথে পরিচালিত হচ্ছে সেই পথ থেকে রক্ষা পেতে হলে যেকোন ভাল খেলোয়াড়দেরই উচিত এই মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ করা। যে দেশের কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য ভারতভূমির কিছু গৌরবান্বিত সন্তান উপযুক্ত মর্যাদা পেল না, উপরন্তু পেল লাঞ্ছনা ও ঘৃণা, সেই দেশের গৌরবের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটা কি অত্যন্ত বোকামির কাজ নয়? কেবলমাত্র সুরজিত সেনগুপ্ত নয়, অতীতের এবং বর্তমানের বহু দিকপাল খেলোয়াড় এই রাজনীতির শিকার হয়েছেন। তাই একজন সামান্য ক্রীড়া রসিক হিসাবে আমার অনুরোধ, সুরজিতদা, আপনার বিদেশে চলে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সেখানে গেলেই আপনি আপনার উপযুক্ত মর্যাদা পাবেন। দেখবেন যে যারা আপনাকে পদদলিত করবার চেষ্টা করেছিল, তারাই আবার আপনাকে মাথায় তুলে রাখবার জন্য অনুরোধ জানাবে।

অমল সিংহ,
খিদিরপুর, কলকাতা।

কে এমন ক্রীড়া বক্তা

২৫।১১।৭৯ তারিখে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'খেলার জগৎ' অনুষ্ঠানে একজন ভদ্রলোকের ভারত এবং পাকিস্তান টেস্ট সম্পর্কে কিছু বক্তব্য শুনলাম। তিনি পাকিস্তানের কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম বলেছেন—যেমন মুদাস্সর নজরকে মুসাদ্দার নজর, সিখান্দার বখতকে সিকান্দার ভগৎ এবং ইকবাল কাশিমকে ইকবাল কাছিম ইত্যাদি।

অলোক কাহালী, মাথাভাঙা, কোচবিহার।

নাচানাচি ভাল লাগে না

খেলার আসর পত্রিকাটির আমি একজন নিয়মিত পাঠক। নিঃসন্দেহে এই পত্রিকাটি ভারতের একটি নামকরা খেলার পত্রিকা। পত্রিকাটির সমস্ত কিছুই আমার ভালো লাগে না, ভালো লাগে না কেবল একটাই—সেটি হলো কলকাতার 'ফুটবল'। কলকাতার ফুটবলকে নিয়ে খুব বেশি নাচানাচি করার মধ্যে আমি কিছু খুঁজে পাই না। কলকাতার ফুটবল বলতে তিনটি ক্লাব (মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং)। যাদের খেলা নিজের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাদের খেলা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্থান পায় না, তাদেরকে নিয়ে নাচানাচি করার চেয়ে, আমরা তাদেরকে নিয়েই নাচানাচি করব যারা আমার দেশের খেলাধূলার মানকে নিয়ে গেছে বিশ্বের দুয়ারে। তাই আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, কলকাতার ফুটবল নিয়ে খেলার আসর পত্রিকাটির পাতাগুলি নষ্ট না করে বিশ্বের দরজায় যারা নিজের নিজের দেশের খেলার মানকে উন্নত করে চলেছেন তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু করে লিখুন।

অতনু রায়চৌধুরী, বিদ্যাধরপুর,
সোনামুখী, বাঁকুড়া।

'পুষ্পেনবাবুর লেখা এবং বাংলায় ধারাবিবরণীর আসল গলদ'

শ্রদ্ধেয় পুষ্পেন সরকারের লেখা 'বাংলায় ধারাবিবরণী, অনেক বাধা' প্রবন্ধ পড়ে মনে হল স্বনামধন্য ভাষ্যকার নিজেদের দোষ ত্রুটি এবং অক্ষমতাগুলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অহেতুক কতগুলি অসুবিধার উদাহরণ দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত শ্রোতারা উল্লেখিত অসুবিধার কথাগুলি মেনে নিলেও কখনই একবাক্যে স্বীকার করবেন না বাংলায় ধারাবিবরণীর মান উচ্চ পর্যায়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, একথাও শ্রোতারা মনে করেন না পুষ্পেনবাবুর অসুবিধার কারণগুলি উত্তেজক, স্পষ্ট এবং মানানসই ধারাবিবরণী দেওয়ার পক্ষে প্রধান বাধা। আমার মনে হয় লেখক অজুহাতের সংখ্যা না বাড়িয়ে যদি ধারাবিবরণীর মান কিভাবে উন্নত করা যায় সেই সম্বন্ধে কিছু বলতেন তাহলে হয়তো উদীয়মান বাংলা ভাষ্যকারদের কাজে লাগতো এবং অনুপ্রেরণা পেত। কিন্তু তা না, তিনি দর্শক/শ্রোতাদের দোষ দিয়েছেন এবং বলেছেন 'মাঠে যারা ট্রানজিস্টার নিয়ে যান তারা খেলা বোঝেন না'। পুষ্পেনবাবুর এই কঠোর মন্তব্য আমাকে পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য করেছে।

পুষ্পেনবাবুর মত স্বনামধন্য বেতার ও টি ভি ভাষ্যকারকে অসম্মান করার স্পর্ধা আমার নেই, তবে যেটুকু সত্য সেটুকুই বলতে চাই নির্ভয়ে। ক্রিকেট মাঠে ট্রানজিস্টার লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে যখন কানের মধ্যে আটকে দিয়ে পুষ্পেনবাবুদের বেতারভাষ্য শুনি কিন্তু দু-চোখ দিয়ে খেলা দেখার মুহূর্তগুলির সঙ্গে আসল তফাৎটা কোথায় তা পরিষ্কার হয়ে যায়। বিশ্বনাথের 'স্কোয়ার কাট'কে যখন পুষ্পেনবাবুর মত বেতার ভাষ্যকারগণ স্কোয়ার ড্রাইভ বলে বর্ণনা দেন অথবা 'ফরোয়ার্ড গ্লান্সকে' (Forward Glance) বলেন 'সুইপ করেছেন' অথবা গাভাসকরের খোঁচা স্লিপের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়ার পর বলে ওঠেন 'আলতোভাবে ব্যাট ছুঁইয়ে দিয়েছেন গাভাসকর' —এই সব বর্ণনার মাধ্যমে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাষ্যকারদের প্রকৃত ক্রিকেট-জ্ঞানের কথা।

তাছাড়া অহেতুক বকবকানির চোটে ওনারা খেলার মুহূর্তগুলির সঙ্গে সমতা বজায় রাখতে পারেন না। 'বল-বাই বল ডেসক্রিপশন' সম্পর্কে বাংলায় ধারাভাষ্যকাররা কতটা ওয়াকিবহাল তার সন্দেহের অবকাশ করে দিয়েছেন নিজেরাই। বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে ধারাবিবরণীর মধ্যে স্থান করে দিতে অনেক ভাষ্যকারগণই চেষ্টা করে থাকেন, শুধু তাই নয় ক্রিকেট অভিধানের চলতি ইংরাজি টার্মগুলিকে জোর করে বাংলা করতে প্রায়শই দেখা যায় বাংলা ভাষ্যকারগণকে, যার ফলে ধারাবিবরণীর সৌন্দর্য এবং মাধুর্য অনেকাংশে নষ্ট হয়। যেমন ধরুন—গুড লেংথ—ভালো লেংথ, সর্টপিচ—খাটো লেংথ, বাউন্ডারী—সীমানা!

বস্তুত, ভাষ্যকারদের ইচ্ছামত বাংলাকরণ বিবরণীর সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে। সর্টপিচকে যখন খাটো লেংথ বলা হয়, তাহলে তো 'ফরোয়ার্ড সর্ট লেগ'কে বলতে হয় 'এগিয়ে খাটো পা' পজিশন অথবা 'কভার'কে 'ঢাকনা' এবং এক্সট্রা কভারকে অতিরিক্ত ঢাকনা বলতে বাধা কোথায়? মোদ্দাকথা হল, প্রচলিত ক্রিকেট অভিধানের ইংরাজি নামগুলিকে জোর করে বাংলায় রূপান্তর করে বাঙ্গালীপনা না দেখিয়ে প্রকৃত খেলার মুহূর্তগুলির সঙ্গে বিবরণীর সামঞ্জস্য রেখে শ্রোতাদের আনন্দ প্রদানে চেষ্টা করা এবং 'বল বাই বল ডেসক্রিপশন'-এর সার্থক রূপায়ণে সক্রিয় হলে সকলেরই মন জয় করতে পারবেন বাংলায় ভাষ্যকারগণ।

রূপম গুহ, পি এন্ড টি স্টাফ কোয়ার্টার্স,
উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৬৭।

এরা কেমন সমালোচক

ভারত-পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ দারুন দো-টানায় পড়ে শেষ হল অমীমাংসিত-ভাবে, কখনো মনে হয়েছিল ভারত হারবে, আবার কখনো মনে হয়েছিল ভারত জিতবে, এরই নাম ক্রিকেট। 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হয়েছেন দিলীপ বেঙ্গসরকর। অশেষ ধন্যবাদ বেঙ্গসরকরকে, তবে বোধহয় সিকন্দর বখতকেও দেওয়া চলত ওই পুরস্কার। তাই বলে আমি বেঙ্গসরকরের হওয়াটাকে অন্যায় বলে ধরছি না, যেভাবে বেঙ্গসরকর চাপের মুখে খেলে গেছেন তার জন্য ধন্যবাদ, তবে অনেকে সমালোচনা করেছেন ভারতীয় খেলোয়াড় এবং গাভাসকরকে। এর কারণ ভারত সময় পেয়েও জিততে পারল না যারা সমালোচনা করেছেন, আমি কিন্তু তাদের দলে নই। ভারত যখন ১২৬ রানে সকলে আউট হয়ে যায় তখন আপনি আমি সকলে ধরে নিয়েছিলাম যে ভারত হারতে চলেছে। কিন্তু সেই হারাটাকেই ভারত আস্তে আস্তে ড্র-এর দিকে নিয়ে গেল। যখন প্রথম ঘন্টায় ভারতের রান ওঠে ২৩ (সম্ভবত) তখন সবাই (আমি যখন শুনছিলাম খেলা) বলছিল যে, ওইটিই খেলা হচ্ছে, কারণ আস্তে খেলতে হবে। কিন্তু যখনই খেলা শেষ হল ড্র ভাবে, তখন আবার তারাই বলতে লাগল ওইভাবে খেললে কি জেতা যায়; ৬০ মিনিটে ২০ রান!—এটা কি ধরনের কথা হল। সর্বদিক দিয়ে বিবেচনা করে সমালোচনা করুন আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনিই পেয়ে যাবেন। এই টেস্টের পর একথা বোঝা যাচ্ছে, ভারতের ব্যাটিং ভারি সুন্দর (আমার মনে হয়), বোলিংও খারাপ নয়।

দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জি
গোপীনাথপুর, বাঁকুড়া।

আলির কার্টুনে চন্দ্রশেখরের অটোগ্রাফ



চন্দ্রশেখরের রেকড সম্পর্কে

খেলার আসরের ৩০ নভেম্বর সংখ্যায় পাঠকের কলমে অজান দাস লিখেছেন যে চন্দ্রশেখর এক সিরিজে ৩৬টি উইকেট নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। কিন্তু তথ্যটি সর্বাংশে ভুল। প্রথমত, তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে '৭২-'৭৩-এ এক সিরিজে ৩৫টি উইকেট দখল করে ভিনু মাঁকড় ও সুভাষ গুপ্তের এক সিরিজে ৩৪টি উইকেটের রেকর্ড ভেঙে দেন। দ্বিতীয়ত, এটি ভারতীয় রেকর্ড, বিশ্বরেকর্ড নয়। এ ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ইংল্যাণ্ডের এস এফ বার্নেস। তিনি ১৯১৩-১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক সিরিজে ৪৯টি উইকেট দখল করেছিলেন।

অবশেষে অজানবাবুকে কিছু বলতে চাই। আপনারা কি কেবল খেলার আসরে নাম প্রকাশের মোহেই চিঠি পাঠান? চিঠি পাঠাবার আগে আপনার তথ্যটি নির্ভুলভাবে জানা উচিত ছিল। আপনি লিখেছেন যে আপনি চন্দ্রশেখরের ভক্ত। সেই হিসেবে চন্দ্রশেখরের রেকর্ডগুলি নির্ভুলভাবে জানা সঙ্গত নয় কি?

অসিত কুমার সাঁতরা,
বাগনান, হাওড়া।

সঠিক নয়

৩০ নভেম্বর খেলার আসরে করিমগঞ্জ থেকে অজান দাস চন্দ্রশেখরের বিশ্বরেকর্ড আছে বলে যা লিখেছেন তা ঠিক নয়। চন্দ্রশেখর একটি সিরিজে সর্বাধিক ৩৫টি উইকেট পেয়েছেন—১৯৭২-৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এটি ভারতীয় রেকর্ড। তিনি ৩৬টি উইকেট কোন সিরিজেই পাননি। ১৯১৩-১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সিডনী বার্নস এক সিরিজে (মাত্র ৪টি টেস্ট) ৪৯টি উইকেট দখল করে যে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন তা আজও অম্লান।

নিতাই দাস, খড়্গপুর-৭২১৩০১।

প্রভাতী নয় শ্যামাদাসী

আপনাদের প্রকাশিত খেলার আসর (৩য় বর্ষ, ৩০ সংখ্যা) পত্রিকার আমি একজন পাঠক হিসাবে লক্ষ্য করলাম যে 'এরিয়ান স্পোর্টসের পর সুব্রতা অবসর নিলেন' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় ছাপা হয়েছে 'মুর্শিদাবাদের মেয়ে প্রভাতী শীল···সে শর্টপাটে ···প্রথম হয়েছেন।' কিন্তু সেটা ভুল। প্রকৃত নাম হবে শ্যামাদাসী ঘোষ।

হেমন্ত ঘোষ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

উপেক্ষিত করিমগঞ্জ

কাছাড় জেলার একটি প্রান্তিক শহর করিমগঞ্জের উপর সরকারী ক্রীড়া সংস্থার সুনজর আছে বলে মনে করি না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে খেলার জগতে করিমগঞ্জের খেলোয়াড়দের অনেক অবদান রয়ে গেছে, যেমন—দেবাশীষ রায় (এরিয়ান), অরূপ দাস (রেলওয়েজ) উভয়েই জাতীয় ফুটবলে এবং অনুপ ভট্টাচার্য ভারতীয় জুনিয়র (১৬ বছর) দলে (সিঙ্গাপুর) প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাছাড়া রাজ্য পর্যায়ের তো অনেকেই আছেন এবং কিছুদিন পূর্বে ১০ নভেম্বর জাতীয় দলের হয়ে করিমগঞ্জেরই ছেলে কালীকাপ্রসাদ দত্ত কানাডার এডমণ্টনে বিশ্ব পাঞ্জা (আর্ম রেসলিং) প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। (এর উল্লেখ 'খেলার আসরে' কিন্তু পেলাম না)।

এখানে নেই ফুটবল খেলার উপযুক্ত মাঠ। যাও আছে সেটাতে ফুটবল মরশুমে আধ হাঁটু কাদা হয়ে থাকে, এর মধ্যেই ক্রিকেট মরশুমে ক্রিকেট খেলা। নেই কোনরকম কোচের ব্যবস্থা। যাও এখানে একটি বাৎসরিক 'রাধাকিশন জৈন শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্ট' অনুষ্ঠিত হত, সেটাও বর্তমানে খামখেয়ালীর চাপে স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার আশা, সরকার যদি এখানে মাঠের সংস্কার, কোচ নিয়োগ এবং স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থাকে সকল প্রকার সাহায্যে উদারতা দেখান তাহলে এই প্রান্তিক শহর থেকে অনেক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ খেলোয়াড় পাওয়া যাবে।

অজান দাস, মদনমোহন রোড,
করিমগঞ্জ-৭৮৮৭১১, কাছাড় (আসাম)।

[এবারের সেরা চিঠির জন্য পুরস্কার পাবেন উল্টাডাঙ্গা মেন রোডের রূপম গুহ]

ফুটবল ঘিরে গণ্ডগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি: নদীয়া জেলায় আঞ্চলিক ফুটবল লিগ শেষ হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই খেলার ফলাফলও প্রকাশ করেছেন। আঞ্চলিক ফুটবল লিগের শীর্ষ স্থানাধিকারী দুটি করে দল নিয়ে জেলা প্রতিযোগিতাও শেষ হয়েছে। গত ৬ নভেম্বর ধুবুলিয়ার অশোক চক্র মাঠে জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া পুলিশ ও কৃষনগর টাউন ক্লাবের মধ্যে। নদীয়া পুলিশ ১-০ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে এবং জেলার সেরা দল রূপে পরিচিত হয়।

মাঠে বিশৃংখলা, রেফারিকে আক্রমণ ও মারা, খেলায় বাধাদান ইত্যাদি অ-খেলোয়াড় সুলভ মনোবৃত্তির দরুণ এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা রানাঘাট অ্যাথলেটিক ক্লাব ও নবদ্বীপ কর্মমন্দির ক্লাবকে বিভিন্ন মেয়াদে সাসপেণ্ড করেন। বহুবিধ অভিযোগের ভিত্তিতে এই দুই ক্লাবের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কেও সাসপেণ্ড করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর রানাঘাট আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা খেলার মাঠে হাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা ও রেফারিকে নিগ্রহের অপরাধে রানাঘাট অ্যাথলেটিক ক্লাবকে এবং ওই ক্লাবের দুই খেলোয়াড় অসীম দে চৌধুরী ও দীপ্তি পাল চৌধুরীকে এক বছর সাসপেণ্ড করে।

একই ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপ অঞ্চলে গত ফুটবল মরশুমে ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ঘটনা যে নিন্দনীয় এবং দোষী ক্লাব ও খেলোয়াড়রা যে সর্বদাই শাস্তির যোগ্য, একথা বিবেচনা করেই নবদ্বীপ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা তাদের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা মাঠে গণ্ডগোল, রেফারিকে আক্রমণ ও মারা এবং লিগ খেলায় অশান্তি ঘটানোর কাজে লিপ্ত এই অঞ্চলের অন্যতম নামী দল কর্মমন্দির ও অ-খেলোয়াড় সুলভ আচরণকারী খেলোয়াড় দ্বয় অমিতাভ ভট্টাচার্য ও আশিস ব্যানার্জির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি ১৬ সেপ্টেম্বরের সভাতেই কর্মমন্দির ক্লাবকে পরবর্তী খেলাগুলিতে অংশগ্রহণ না করার নির্দেশ দেন। এবং অভিযুক্ত খেলোয়াড়দ্বয়কে সাসপেণ্ড করা হয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে, নবদ্বীপ জোনাল অ্যাসোসিয়েশন ও কর্মমন্দির ক্লাব যৌথভাবে জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই শাস্তি দানের নির্দেশের বিরুদ্ধে জেলা ট্রাইবুনালে আপীল করে এবং ট্রাইবুনাল অমিতাভ ভট্টাচার্যর উপর থেকে সাসপেনশন অর্ডার তুলে নেওয়ার জন্য কার্যনির্বাহী সমিতিকে পুনর্বিবেচনার আদেশ দিয়েছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খো খো প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খো খো অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলা খো খো অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় বার্ষিক রাজ্য খো খো প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির বসেছিল বহরমপুরের ভ্রাতৃসংঘ প্রাঙ্গণে। রাজ্যের প্রায় ১০টি জেলার ১৮জন খো খো প্রশিক্ষক ২১ দিনের এই শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য সংস্থার এন আই এস ট্রেনিং-প্রাপ্ত কোচ দিলীপ রায়, প্রণব রায়, তপন তালুকদার ও রাধানাথ সরকার প্রশিক্ষকদের শিক্ষা দেন।

১৭ নভেম্বর শিক্ষা-শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলা খো খো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জেলাশাসক অশোক গুপ্ত। ১ ডিসেম্বর রাজ্যক্রীড়া পর্ষদের সদস্যেরা শিক্ষা শিবির পরিদর্শন করতে আসেন। ৭ ডিসেম্বর শিবিরের সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে কোচ দিলীপ রায় শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের নিজ নিজ এলাকায় খো খো খেলার প্রসারের জন্যে সচেষ্ট হতে বলেন। ●

শব্দ জব্দ

অমিতাভ মৃধা, সপ্তম শ্রেণী,
সত্যনারায়ণপুর শশীভূষণ হাই স্কুল,
পোঃ আমেথী, জেলা ২৪ পরগণা।

পাশাপাশি

১। গত বিশ্বকাপ হকিতে ভারতের এই সেণ্টার হাফটি গত বছর এক পথ দুর্ঘটনার শিকার হন।

২। সদ্য সমাপ্ত ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের শেষ টেস্টে ব্যাট হাতে হঠাৎ জ্বলে ওঠা ভারতীয় অলরাউণ্ডারের ডাক-নাম।

৪। এবছর লিগে জর্জের এই খেলোয়াড় ময়দানের অন্যতম বড় দলের জালে দুবার বল পাঠিয়েছেন।

৭। অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ দ্রুতগতি বোলারটি প্যাকার সিরিজে যোগ দেওয়ায় ভারত সফরে আসতে পারেননি।

৯। ইংল্যাণ্ডের এই দীর্ঘকায় অধিনায়কটি কলকাতার দর্শকদের দারুণ আনন্দ দিয়েছিলেন গত ভারত সফরে।

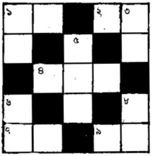
উপর-নিচ

১। বিশ্বের একমাত্র টেনিস খেলোয়াড় যিনি পরপর চারবার উইম্বলডন জিতেছেন।

৩। ১৯৭২-'৭৩-এ ভারত সফরকারী ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।

৫। হায়দ্রাবাদ জাত এই তরুণ ক্রিকেটার জাতীয় দলে আবির্ভাবেই সাড়া জাগিয়েছেন।

৬। ইংল্যাণ্ডের এই প্রাক্তন অধিনায়ক প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এক মরশুমে দশবারের বেশী হাজার রান করেছিলেন।



৮। সদ্য সমাপ্ত ভারত সফরে সাফল্য না পেলেও স্বদেশে ফিরেই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৯৩ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছেন।

শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান

নাম ____________

অভিভাবকের নাম ____________

ঠিকানা ____________

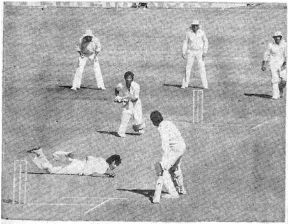
বিদ্যালয় ____________

বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ____________

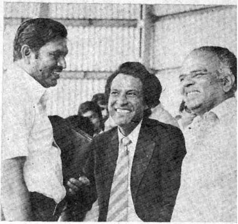
বিদ্যালয়ের সীলমোহর ____________

ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট

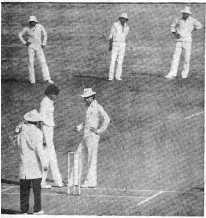
ছবিঃ সন্তোষ ঘোষ



শিবলাল যাদবের একটা ড্রাইভ ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরলেন সিকান্দার বখত



বাঁদিক থেকে চান্দু বোরদে, সাঈদ আমেদ এবং মঞ্জরেকর

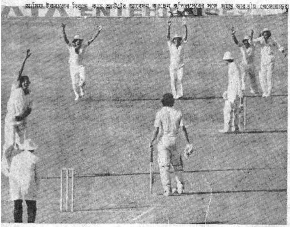


আম্পায়ার সিকান্দার বখতের এক ওভারে চারটি বল 'নো' ডাকায় বোলার ও অধিনায়ক আসিফ ইকবালের সঙ্গে আম্পায়ারের বচসা

রজার বিন্নির বলে অফ স্টাম্প ছিটকে গেল জাহির আব্বাসের



আসিফ ইকবালের বিরুদ্ধে কট আউটের আবেদন করছেন কপিলদেবের সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়রা



গাভাসকরের উইকেটটি পাওয়ায় পাকিস্তান খেলোয়াড়দের আনন্দ-উচ্ছ্বাস



কোয়েম্বাটুরে ছত্রিশতম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

প্রাথমিক পর্বের গ্রুপ লিগেই গত বছরের সেমিফাইনালিস্ট মহারাষ্ট্র প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হওয়ায় এবারের সন্তোষ ট্রফির উদ্যোক্তা রাজ্য তামিলনাড়ুর সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশও খেলার যোগ্যতা পেয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে। এক নম্বর ক্লাস্টারে পরপর চারবার চ্যাম্পিয়ন বাঙলার সঙ্গে পড়লো শক্তিশালী দলগুলো কেরালা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ। দ্বিতীয় গ্রুপে উঠেছিলো পাঞ্জাব, গোয়া, সার্ভিসেস ও তামিলনাড়ু। রাউণ্ড লিগে বাংলা প্রথম খেলেছিল জম্মু ও কাশ্মীর দলের সঙ্গে। খুব সাদামাটা খেলায় বাংলা জয় পেল ৩-০ গোলে। প্রথম ম্যাচে বাংলার ছেলেরা তাদের স্বাভাবিক দক্ষতার কোন নজিরই রাখতে পারেননি। সুব্রত ও সুরজিৎ তখনো কোয়াম্বাটুরে এসে পৌছননি। কম্পটন, অধিনায়ক প্রসূন ও সাব্বির ছাড়া আর কেউ গা ঘামিয়ে খেলেননি। প্রথম দুটি গোলই করেছেন সাব্বির। শেষেরটি এসেছে ডেভিড মারফৎ। ডেভিড শেষ ২৬ মিনিট খেলেছিলেন পায়াসের বদলি হিসেবে।

এক বছর আগে জম্মু ও কাশ্মীরের ছেলেরা শ্রীনগর ন্যাশনালে যে ফুটবল খেলেছিলেন তার চাইতে ওরা একটু ভালো দক্ষতা দেখিয়েছেন। ওদের মধ্যে সেরা খেলোয়াড় ইউসুফদার এবারের দলে ছিলেন না, ইম্ফলে অল ইণ্ডিয়া স্টেট ট্রান্সপোর্ট ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলতে যাওয়ায়। প্রি-ওলিম্পিক ফুটবলে এই রাজ্য থেকে সম্ভাব্য দলের তালিকায় ঠাঁই পাওয়া মুখতার আমেদ অতি সাধারণ প্লেয়ার।

কোয়েম্বাটুর থেকে দিলীপ সরকার

যখন তখন বল মাঠের বাইরে পাঠিয়ে বিপক্ষ ফরোয়ার্ডদের আক্রমণ রুখতে তিনি ওস্তাদ। জম্মু ও কাশ্মীর মাটিতে বল রেখে লম্বা পাশে খেলছিল। গোল করার মত সুযোগ তারা একবারও তৈরি করতে পারেননি।

অবাক করেছেন মানস ও বিদেশ। কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন খেলছিলেন তারা। মানসের একা গোল করার ইচ্ছা বাংলার বেশি গোল পাওয়ায় বাদ সেধেছিলো।

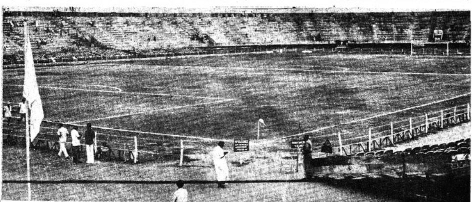
সাব্বিরের প্রথম গোলটা ছিল চমৎকার বোঝাপড়ার দ্বারা। মানস একটা ফ্রি-কিক পেয়েছিলেন বক্সের ভেতরে। আগুয়ান গোলকীপারকে দেখে পায়াস ঠেলে দেন ডাইনে দাঁড়ানো সাব্বিরকে। অতি সহজেই সাব্বির শেষ কাজটি সারেন।

তারপর প্রসূনের তীব্র একটি শট গোলকীপার মহম্মদ আলতাফ গ্রিপে না রাখতে পারলে সাব্বির ছুটে গিয়ে গোলে ঠেলে দেন সাব্বিরের কোণাকুণি শট পোস্টে আঘাত লেগে ফিরে আসতেই আনমার্কড ডেভিড শেষ গোলটি করেন।

গ্রুপ লিগের দ্বিতীয় এবং শেষ খেলাতেও বাংলার ৫-০ জয় হল। বাংলার ছেলেদের কাছে পণ্ডিচেরী কোন বাধাই নয়। তবু বাংলা খেললো নিস্তেজ ও স্লো ফুটবল। অধিনায়ক প্রসূন এ ম্যাচেও আগাগোড়া দাপটে লড়লেন। দেখার মত খেলেছিলেন কম্পটন প্রচুর পরিশ্রম সহকারে। উনি এখন অনেক দায়িত্ব নিয়ে খেলছেন সুন্দর জায়গা নিয়ে।

প্রথমে সত্যজিৎ এবং পরে গোটা দ্বিতীয়ার্ধ খেললেন প্রেমনাথ ফিলিপ। বিদেশের বদলি হলেন ডেভিড উইলিয়ামস। প্রসূনের উঁচু লব গোলমুখে পৌছলেন পণ্ডিচেরীর রাইট ব্যাক রামচন্দ্রন ব্যাকপাস দিলেন গোলকিপারকে। কিন্তু আগুয়ান গোলকিপারকে চমৎকার ফাঁকি দিলেন সাব্বির ঝটিতি বল ঠেলে দিয়ে। বিদেশের কাছ থেকে বল পেয়ে সাব্বির দ্বিতীয় গোল করেন দুই ডিফেণ্ডারের মাঝখান দিয়ে জায়গা করে। সাব্বিরের একটা মাথায় ঠেলা বল গোল হল না এবং হ্যাট্রিকও—রেফারি কেদার মূরের অফ সাইডের সংকেতে। দ্বিতীয়ার্ধে মানসের একটা কোণাকুণি শটে বাংলা শেষ গোল পায়। দারুণ উত্তেজনায় কোয়ার্টার ফাইনাল লিগ শুরু হল বাংলা—কর্ণাটক লড়াই দিয়ে। অদ্ভুত ভালো সংযম দেখিয়েছিলেন বাংলার সব খেলোয়াড়। কর্ণাটকের রাইট ব্যাক লুইস, রাইট হাফ আসলাম খান প্রমুখের বারবার ফাউলের চেষ্টা খেলাটা ধীর গতিতে হতে বাধ্য করে। সুরজিৎ ও ভাস্কর এই দিনেই প্রথম কলকাতা থেকে উড়ে এসে মাঠে নামে। দু'জনেই খেলেছেন অতি সাধারণ। সুরজিৎকে গোড়ায় খেলানো হয়েছিল লেফট স্ট্রাইকার হিসাবে। বিদেশ এদিনও ব্যর্থ হন তার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় ডিফেন্স চিড়তে। শেষ ১৪ মিনিট তাই ডেভিডকে খেলানো হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এই ব্যবস্থায় খেললে বাংলার আক্রমণ লাইন আরো বলীয়ান হতো।

শ্যামল ব্যানার্জি ও অমলরাজ খুব ভালো খেলেছিলেন সেদিন তবে বাংলা দলের মাঝ



কোয়েম্বাটুরের নেহরু স্টেডিয়াম এখানেই হচ্ছে ৩৬তম জাতীয় ফুটবলের আসর



অসহায় গোলকিপার মোহন দাস - অমলরাজ বাইরে সট করে সযোগ হারান

মাঠে গোতমের অভাবটা পারিষ্কার হয় সবার মনেই যারা এর আগে তাকে রাজ্য দলে খেলতে দেখেছেন। দর্শকের সমর্থনপুষ্ট কর্ণাটকের বারবার অহেতুক ফাউল-প্লেতে বাংলার ছেলেরা খুব সতর্ক হয়ে খেলেছিলেন। বেশির ভাগ আক্রমণই তারা তৈরি করতেন ডান দিক দিয়ে, যেখানে ছিলেন মানস ও সুরজিত। গোলদাতার ভূমিকায় একবারও অবতীর্ণ না হয়ে সুরজিত সেদিন ছিলেন প্লে-মেকারের ভূমিকায়। কর্ণাটক বাংলার গোল সীমানায় প্রথম হানা দিয়ে বিপদের সৃষ্টি করেছিল। কুমারের থ্রু পাস থেকে সুব্রত বল পায়ে রাখার জন্য কর্ণাটকের লেফট স্ট্রাইকার কৃষ্ণমূর্তি একবার ঢুকে পড়েন। কৃষ্ণমূর্তির মাথার ওপর থেকে চকিতের ডাইভে বল ধরেন ভাস্কর। সুরজিতের ফ্রি-কিক পড়ে গোলমুখে সাব্বিরের সামনে। সাব্বির হেডে বল পাস করেন ডাইনে দাঁড়ানো মানসকে। মানস সেই বল মাটিতে পড়ার আগেই তীব্র ডাইভে গোল পান। বাংলার ছেলেরা একটি মাত্র গোলে এগিয়ে থেকেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে শেষ পর্যন্ত খেলে যাওয়ায় খেলাটির সুষ্ঠু সমাপ্তি ঘটে। মহারাষ্ট্রের রেফারি জে পি কুটিনহোর পরিচালনা প্রশংসার দাবী রাখে। কর্ণাটক খেলে ছোট ছোট পাসে জায়গা বদল করে। বার দুয়েক তারা বাংলার রক্ষণে ভালো রকম উৎপাত শুরু করেছিলেন। কিন্তু সুব্রত ও মনোরঞ্জন অদ্ভুত অবহেলায় রুখে দিয়েছেন তাদের আক্রমণ।

রাইট আউট উমেদ সিং-এর একটি মাত্র গোলে সার্ভিসেস হারায় বি গ্রুপের খেলায় তামিলনাড়ুকে। তামিলনাড়ু কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে সবচেয়ে দুর্বল দল।

১৬.১২.৭৯

সন্তোষ ট্রফি কোঃ ফাইনাল

অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে ড্র হবার পরই গত চারবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাকে নিয়ে এবারের ন্যাশনালে উল্টো ভাবনা শুরু হয়েছিলো। কারণ ছিলো অনেকগুলো। এক, বাংলা তাদের সুনাম অনুযায়ী কিছুই খেলতে পারছে না। দুই, ভারতীয় ফুটবলের আপাতস্বপ্ন প্রি-ওলিম্পিক ফুটবলের সম্ভাব্য ভারত দলের তালিকায় বাংলার ছেলেরাই আছে ঠিক অর্ধেক। প্রত্যেকের খেলাতেই নজর পড়ছে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য জাহিরের চেষ্টা। তিন, গত দু বছরে দেশে-বিদেশে প্রচুর টুর্নামেন্ট খেলা সত্ত্বেও বাংলা থেকে আসা এইসব স্টাররা গোটা একটি রাজ্যের সম্মানের জন্য জানপ্রাণ কবুল করতে পারছেন না কোন খেলাতেই। চার, কলকাতা লিগের একাধিক ভিন্‌রাজ্যের স্টার জড়ো হবার পর বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের কোন্দল সৃষ্টির কাহিনী প্রত্যেক ফুটবল বিশেষজ্ঞরই জানা। সেইসব খেলোয়াড়রা ফেডারেশন কর্তাদের সামনে বিজয়ের হাসি ছড়িয়ে মাঠে নামছেন এবং দুর্বল মন নিয়ে যাচ্ছেতাই খেলছেন এবং কেরালা ও অন্ধ্রের বেশ কিছু তরুণ ফুটবলার এই প্রথম সন্তোষ ট্রফি খেলেন এবং অনেকের নজর কাড়েন :

প্রাথমিক লিগে বাংলা ছাড়াও সেমি-ফাইনালে পৌঁছবার দাবীদার হয়ে উঠেছিলো গোয়া, কেরালা, কর্ণাটক ও পাঞ্জাব। দুই গ্রুপেরই শেষ খেলা হলো ১৯ ডিসেম্বর। বাংলা ও কেরালার ম্যাচের আগের অবস্থাটা বড়ই জটিল। কর্ণাটক তিনটি খেলা শেষ করেছে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে। অন্ধ্র আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছিলো দুই পয়েন্ট তিনটি



মানসকে ব্যর্থ করল মোহন দাস (কর্ণাটক)

খেলায় পাবার সুবাদে। পরে এইদিকে দুটি করে ম্যাচ খেলে বাংলার সংগ্রহ তিন এবং কেরালার দুই। প্রতিযোগিতা শুরু থেকেই কেরালা বাহিনীর দাপট ছিল। যদি শেষ ম্যাচটি কেরালা জয়ী হয় তবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমি-ফাইনালে যাবে আর বাংলা খেলার যোগ্যতা হারাবে ৭৩-এর পর প্রথম বার।

বাংলা শিবিরে অবশ্য কোন অতিরিক্ত প্রস্তুতি ছিল না। তবে দল গড়া হয়েছিল


কর্ণাটকের গোলকিপার মোহন দাস সাবিরের মাথা থেকে বল বিপদমুক্ত করছেন

সেরা এগারো জনকে নিয়ে, কেবল সুরজিত ও কম্পটন ছিলেন না।

এর আগে অন্ধ্র-বাংলা ম্যাচের আগের দিন একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। শ্রীনগর ন্যাশনালের মতো এবারেও সংগঠক কমিটি ফেডারেশনের তরফে সব দলের ম্যানেজারকে চিঠি মারফৎ জানালেন, কোন খেলোয়াড় যেন পাথর বসানো আংটি আঙুলে নিয়ে মাঠে না নামেন। গত ন্যাশনালের মতো কোন প্লাস্টার বাঁধাও চলবে না। আংটি হাত থেকে খুলে তবে খেলতে হবে। বাংলা ছাড়া এই বিষয়ে অন্য রাজ্যের ছেলেদের মধ্যে কোন উৎসাহ নেই বললেই চলে। কিন্তু বাংলার ছেলেরা আংটি খুলতে নারাজ। কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসের ফলেই এরা এসব পরে থাকেন।

বিভিন্ন রাজ্যের ম্যানেজাররা নানারকম উত্তর জানালেন চিঠিতে। তাদের বেশির ভাগই জানালেন, ছোটখাটো ব্যাপারে আমরা উৎসাহী নই। সংগঠকদের কথাতেই আমরা রাজি। এদিকে বাংলার ছেলেদের আব্দার চরমে পৌঁছতেই বাংলা দলের ম্যানেজার চিঠির উত্তর দিতে ফাঁপরে পড়লেন।

শেষমেশ তিনি সমস্যাটা মেটাবার রাস্তা পেলেন সংবিধান থেকে। মানব দত্ত চিঠিতে জানালেন, বাংলার ছেলেরা জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন। এবং অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এমন কোন আইন বলেই বাংলার খেলোয়াড়দের হাত থেকে পাথর বসানো আংটি খোলার অধিকার পেতে পারে না। কারণ ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের জ্যোতিষ বিশ্বাসের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং মৌলিক অধিকারের ওপর হাত কেন?

চিঠি পেয়ে দারুণ হাসি ঠাট্টার পর সিদ্ধান্ত হলো যে খেলোয়াড়রা গত বছরের মতই আঙুলে প্লাস্টার লাগিয়ে খেলতে পারবেন।

যাই হোক, বাংলা অন্যকোন ব্যাপারে আর কোন বাধা এ পর্যন্ত পায়নি। শুধু মাঠে খেলোয়াড়দের আশা মত না খেলা ছাড়া।

এই ম্যাচটির আগে এই প্রথমবার নেহরু স্টেডিয়াম ঠাসা হয়ে গেলো দর্শকে। এখান থেকে কেরালা সীমান্ত খুবই কাছে এবং পালঘাট জেলা দেড় ঘণ্টার রাস্তা। পালঘাট থেকেই বেশীর ভাগ ফুটবল ভক্ত এসেছিলেন সেদিন।

দর্শকের সমর্থন পুষ্ট কেরালা দলটি খেলেছিল চমৎকার। প্রথম দশ মিনিট বাংলা ওদের রক্ষণে কয়েকবার হানা দিয়েছিল। বাকি সময় কেরালা নাস্তানাবুদ করে ছাড়লো বাংলাকে। ছোট বড় প্রয়োজনীয় পাসে কেরালাই বেশীর ভাগ সময় গোল তৈরির চেষ্টাতে ব্যস্ত ছিল। দলের রসিদ, অশোকন ও মোহন তিনজনেই এই প্রথমবার সন্তোষ ট্রফি খেললেন। অশোকন, নাজিমুদ্দিন ও বালচন্দর গোলমুখে ধেয়ে যাবার কৌশলগুলি দেখবার মতো। ভালো স্ট্রাইকার থাকলে কেরালা গোল পেতে পারত। বাংলার খেলা মাঝমাঠেই ছিলো ভালো—প্রসুন ও অমলরাজ শুরু থেকে শেষ অবধি ভালো খেলে যাবার ফলে। ফরোয়ার্ড লাইনে বিদেশ প্রথমার্ধে কেবল কয়েকবার বিপক্ষ রক্ষণে ফাটল ধরাতে পেরেছিলেন। শেষদিকে তার খেলা আগের খেলাগুলোর মতই হয়েছিল। বিদেশের সেন্টার থেকে একবার সাব্বির মাথা ঠেকিয়ে বল গোলে পাঠান। কিন্তু তা ক্রসপিসে আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ার মুহূর্তেই গোলকিপার ভিক্টর মঞ্জিল একহাতে ফিরিয়ে দেন। আরও একবার প্রসুনের কাছ থেকে পাওয়া বলে সাব্বির তীব্র শট নিলে ভিক্টর তা পাঞ্চ করেন। শেষ তিরিশ মিনিট মানসকে বসিয়ে ডেভিডকে খেলান হলেও বাংলা গোল করার মত সুযোগ পায়নি।

বাংলা চার পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হতেই কেরালাকে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। গোলের গড়ে কর্ণাটক পৌঁছে যায় সেমিফাইনালে।

একমাত্র পাঞ্জাবের সঙ্গে জিতে এবং সার্ভিসেসের ও তামিলনাড়ুর সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করে গোয়া 'বি' গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছিল। সার্ভিসেসকে হটিয়ে পাঞ্জাব এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছলো। শেষ খেলায় পাঞ্জাব তাদের সব শক্তি ও বুদ্ধি ঢেলে দিয়েছিল। যুগ্ম কোচ জন ও মাধবনের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠায় সার্ভিসেস খেলোয়াড়রা শুরু থেকেই দাপটে খেলেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি।

ইন্দার সহ একাধিক নামী খেলোয়াড় ছাড়াই পাঞ্জাব তিনটি খেলায় দুটিতে জিতল। শেষের কয়েক মিনিট আগে পাঞ্জাব একমাত্র গোলটি করে রাইট স্ট্রাইকার বলবিন্দর সিং-এর মারফতে। ১৯.১২.৭৯

সন্তোষ ট্রফি—কোয়ার্টার ফাইনাল লিগ

সাতটি নতুন ছেলে নিয়ে অন্ধ্র প্রদেশ খেলতে নেমেছিলো তাদের দ্বিতীয় খেলা বাংলার বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনাল লিগের প্রথম ম্যাচে অন্ধ্র হেরেছিলো ০-১ এ কেরালার কাছে। অন্যদিকে বাংলার সকলেই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। কোচ বা প্লেয়ার যার সঙ্গেই খেলার আগে কথা বলেছি সকলের জবাব—বাংলার পক্ষে এই ন্যাশনালে যে কোন দলকে হারানো কোন ব্যাপার নয়।

বাংলা দলে এদিনও সুরজিতকে খেলতে দেওয়া হয়েছিলো রাইট স্ট্রাইকার পজিশনে। দুপুরে হোটেলে সুরজিতের ঘরে বসে দল নিয়ে আলোচনার সময়েই ওর মনে চাপা অসন্তোষের আঁচ পেয়েছিলাম কয়েকটি কথায়। কোচ ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্ক এবং সব খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রাণখোলা হৃদয়—অন্য দিকে ভারত দলের দায়িত্ব পাওয়ার ব্যাপারটা মানসিক কষ্ট দিচ্ছিলো সন্তোষ ট্রফি শুরু

হবার আগে থেকেই। বাংলার সব খেলোয়াড়দের সন্তোষ ট্রফি ম্যাচ খেলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাটাই সম্ভবত কোচ অচ্যুত ব্যানার্জি মাথায় রেখেছিলেন।

কোয়ার্টার ফাইনাল লিগের এই ম্যাচটা জিতে নেবার অনেক গুরুত্ব ছিল বাংলার পক্ষে সেমিফাইনালে খেলাটা নিশ্চিত করার জন্য।

শুরুতে বাংলা ধেয়ে গেলো অন্ধ্রের রক্ষণে ফাটল ধরাতে। প্রসূন ও কম্পটন ছিলেন তখন আক্রমণ তৈরিতে ব্যস্ত। মিনিট ছয় বাদে বাংলা গোল পেল। মানসের সেণ্টার পেয়ে বিদেশ হেড করলে বল গোলে ঢুকছিলো। উঁচু বল গোল লাইনের মুখ থেকে হাতে ফেরান অন্ধ্রের রাইট স্টপার আলেম খান। বাংলা পেনাল্টি পেলো। এবং বিদেশ তাতে গোল করতে ভুল করেননি।

গোল হবার পরেই বাংলার খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেললেন গোল করার কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে। মজার ব্যাপার ডিফেন্স থেকে বল হাফ লাইনে। সেখান থেকে আবার ডিফেণ্ডারদের কাছে। মানস ও বিদেশ একাই ঢুকবার চেষ্টা করেন বল নিয়ে। সাব্বির কোন সহযোগিতা না পেয়ে চুপচাপ ঘোরাফেরা করেছেন। সুরজিতও ভুলে যান হাফ লাইনে প্রসূনকে সহযোগিতা দিতে। সুকুমার সারা ম্যাচ ছুটে বেড়িয়েছেন প্রায় সময় বল ছাড়াই। অথচ আগের ম্যাচে খুব ভালো খেলেও অমলরাজ জামা গায়ে বসেছিলেন পুরো সময় সাইড লাইনের ধারে।

সুরজিত একবার মাত্র উঠে এসে আক্রমণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। চোট পাওয়া হাঁটুতে ফের আঘাত পেয়ে সুরজিত বসে যান এবং খেলতে নামেন পায়াস।

বাংলার এই হাল দেখে অতি সাধারণ ফরোয়ার্ড লাইন নিয়েও অন্ধ্রপ্রদেশ বেশ কয়েকবার ধেয়ে যায়। স্টপার সুব্রত বেশী আত্মবিশ্বাসে বল পায়ে রেখে কয়েকবার ভাস্করকে সতর্ক হয়ে নড়তে চড়তে সাহায্য দিলেন।

অন্ধ্র একটি গোল করার মত চমৎকার সুযোগ পেয়েছিল। লেফট আউট জেভিয়ার ফ্রান্সিসের সেণ্টার থেকে রাইট স্ট্রাইকার মুজাফফর বল পান যখন, তখন বাংলার কেউই ছিলেন না। ফাঁকা গোল। কিন্তু মুজাফফরের শট বাইরে চলে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলার খেলার হাল একই রকম ছিল। শুধু ডিপ ডিফেন্স ও মাঝমাঠে বল দেওয়া নেওয়া। ঠিক যেমন কলকাতা মাঠে লিগ লড়াইয়ে এইসব স্টাররা পাঁচ গোলে এগিয়ে থেকে সময় কাটান তেমনি।

মানসের বদলি নামলেন ডেভিড উইলিয়াম। অন্ধ্রের লেফট ব্যাক ওমপ্রকাশকে লাথি মারার দায়ে রেফারি সুন্দর পাণ্ডিয়ান (তামিলনাড়ু) হলুদ কার্ড দেখালেন ডেভিডকে। ডেভিড শাস্তি পেলেন অপরাধের থেকে একটু অতিরিক্ত।

বাংলার সব খেলোয়াড়দেরও ফল পেতে হলো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্যে—খেলা শেষের ঠিক তিন মিনিট আগে।

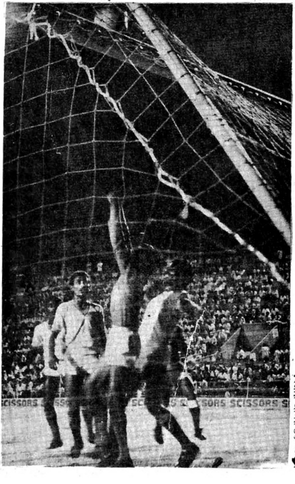
রাইট উইঙ্গার চৌধুরী মাঝ মাঠে শ্যামলের কাছ থেকে বল কেড়ে তীব্র বেগে ঢুকে যান এবং সেণ্টার করেন। মনোরঞ্জনের হেডে বল ডাইনে কেটে গেলে ঠিক সময়ে ওৎ পেতে দাঁড়ানো মুজাফফর তাতে সুন্দর ব্যাকভলি করলে ভাস্করের কোন উত্তর দেবার সুযোগ ঘটেনি।

চমৎকার খেলা হয়েছিল গোয়া ও সার্ভিসেসের মধ্যে। প্রচণ্ড পরিশ্রম সত্ত্বেও কোন দলই গোল পায়নি। কাজেই দু'পক্ষের ডিফেণ্ডাররাই বাগড়া দিয়েছেন সমভাবে।

উমেদ সিং ও হেক্টর সার্ভিসেসের পক্ষে একবার করে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু গোয়া গোলকিপার ব্রহ্মানন্দ তাতে বাদ সেধেছেন। বিপক্ষ রক্ষণে ভালো স্যুটারের অভাবে গোয়া পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি।

এর আগে দু'দলই একটি করে খেলেছিলো এবং দুই পয়েণ্ট করে সংগ্রহ করেছিলো। প্রাথমিক লিগে গোয়া যা খেলেছিল তার চাইতে অনেক ভালো খেলেছিল তারা কোয়ার্টার ফাইনাল লিগে। ওদের লেফট স্ট্রাইকার প্রকাশ নায়েক, হাফ হারবার্ট ও রাইট ব্যাক নিকোলাস পেরেরা গোটা টিমকে শক্তি যুগিয়েছিলেন শেষ মিনিট পর্যন্ত।

১৯.১২.৭৯



ছবি : লক্ষ্মণ গোস্বামী

পাণ্ডিচেরীর গোলমুখে বাংলার হানা

উন্নতমানের খেলা হলেও স্কুল ছাত্ররা সুব্রত কাপের খেলা দেখতে যায় না

নয়াদিল্লি থেকে বিশেষ প্রতিনিধি



মণিপুর গোলমুখে উত্তেজনা

ক্ষুদে ডুরাণ্ড অর্থাৎ সুব্রত কাপ জয় করেছে মণিপুরের ইবেমচা হাই স্কুল। ফাইনালে ওরা ওদের চেয়ে বেঁটেখাটো আসামের কোকড়াঝার গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের ছেলেদের হারায় ১-০ গোলে। দুটি দলই পূর্বাঞ্চলের। লক্ষণীয় এবারের টুর্নামেণ্টে পূর্বাঞ্চলের স্কুলগুলিই সেমিফাইনালে ওঠে। ফলে দেশের ওই অংশের ফুটবলের শক্তি, সামর্থ্য ও তার ক্রমোন্নতির কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

ফাইনাল খেলা অবশ্য খুব চিত্তাকর্ষক হয়নি। তবে তার আগের রাউণ্ডগুলির বেশ কয়েকটি খেলা দর্শকদের মন ভরিয়েছে। যেমন, তৃতীয় রাউণ্ডে চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে গোয়ার সেণ্ট রিতা'জ স্কুলের ম্যাচটি। রিতা'জ স্কুল ২-৩ গোলে হার মানে তাদের শারীরিক সক্ষমতার অভাবের জন্য। তবে দক্ষতায় তারা অনেক বেশি উন্নত চ্যাম্পিয়ন দলের চেয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে।

দর্শকসংখ্যা সব ম্যাচে, এমনকি ফাইনালেও কম ছিল। যাও ছিল তার মধ্যে স্কুল ছাত্র ছিল সামান্য। ফাইনালে একমাত্র গোল করেন প্রিয়কুমার। বলটি রাইট উইঙ্গার গফুর সময় বুঝে বুদ্ধি খাটিয়ে গোলমুখে উঁচু করে দিলে প্রিয় তৎপরতার সঙ্গে হেড করে তা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন।

মজার ব্যাপার হলো, গফুর প্রতিটি ম্যাচ ভাল খেলেছেন,-শুধু নয়, ভয়ানক বুদ্ধি খাটিয়ে দলকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। কিন্তু প্রতিভা-শিকারীদের চোখে পড়েননি। গফুরের দুর্ভাগ্য, না সৌভাগ্য কে জানে, প্রতিভা-শিকারীরা যে ১৬ জন কিশোর ফুটবলারকে বৃত্তি দেবার জন্য সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে গফুরের নাম নেই।

দলের সাফল্যে মণিপুরের কোচ খুশি। তিনি জানালেন, মণিপুরে প্রতিভা আছে অনেক, কিন্তু প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ বড় অল্প। অনেক অভাব অভিযোগের মধ্যে যারা একটু ভাল খেলতে শুরু করে তারাই বৃত্তির সন্ধানে দেশত্যাগ করে। নরেন্দ্র গুরুং এই মণিপুরেরই খেলোয়াড় বলে কোচ গর্ববোধ করেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এ কর্মরত নরেন্দ্র গত এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় দলে স্থান পান। পাঞ্জাবের হয়ে তিনি এখন সন্তোষ ট্রফি খেলছেন।

তবে এবছর গতবারের চেয়ে উন্নতমানের ফুটবল দেখা গেছে সুব্রত কাপে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন শিলং-এর সেণ্ট এ্যাণ্টনী হাই স্কুল প্রথম রাউণ্ডে ৯-০ গোলে জেতে। দুরূহ কোণগুলি থেকে তাদের চমকপ্রদ শ্যুটিং-এ গোল পাওয়া দেখার মতো ছিল। কিন্তু সেমিফাইনালে কোকড়াঝারের কাছে তারা যেন কুঁকড়ে যান।

গতবারের রানার্স আপ মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল (বাংলা) সেমিফাইনালে হারে ইবেমচা স্কুলের হাতে।

বেআইনী খেলোয়াড় খেলানোর জন্য এয়ারফোর্স সেণ্ট্রাল স্কুল টুর্নামেণ্ট থেকে খারিজ হয়ে যায়। বয়স ভাঁড়ানোর যে অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে ছিল তা প্রমাণিত হয়। তবে জিলা স্কুল (বিহার), সেণ্টপলস (বোম্বাই), এন সি সি (উত্তর পূর্বাঞ্চল), ডিমাপুর গভর্নমেণ্ট স্কুল প্রভৃতি দলের খেলোয়াড়দের কোচিং দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ষোলজন খেলোয়াড়কে বৃত্তি দেবার জন্য নির্বাচিত করা হয়। তারা হল :—

প্রদীপ সেনগুপ্ত—মধ্যমগ্রাম স্কুল. পঃ বঙ্গ, যোগেন্দ্র—মতিলাল নেহরু স্পোর্টস স্কুল, রাই, দীপচরণ—কোকড়াঝার গভঃ স্কুল. ইবো সিং—ইবেমচা, মণিপুর, রামপ্রবেশ শর্মা—এন সি সি, বিহার, লুই সুজা—সেণ্ট রিতা'জ স্কুল, গোয়া, এস এম নাসভি—লক্ষ্ণৌ স্পোর্টস স্কুল, পন্তি—ডিমাপুর গভঃ স্কুল, তুঙ্গে—আলভ, মহিন্দরলাল—মহিলপুর গভঃ স্কুল, পাঞ্জাব, এ্যাসলে গিবস্—সেণ্টপলস, বোম্বাই, শিইতো—এন সি সি উত্তর-পূর্বাঞ্চল, জর্জ ম্যাথুজ—জিভি রাজা স্কুল, কেরালা, ফুলমুন—সেণ্ট এ্যাণ্টনি, শিলং, মনোজকুমার—জিলা স্কুল, বিহার, হিলারী—কারনিকোবর গভঃ স্কুল। ●



সুব্রত কাপ হাতে উল্লসিত ইবেমচা খেলোয়াড়রা। ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে কোচ

মুদ্রক ও প্রকাশক : অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী. ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬. ১৭-১১৬৯ থেকে প্রকাশিত।

জয় ফুটবল জয়

আলেখ্য : ভাল্টার নয়গেবাউয়ার
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত





য় ফ্যাব্রিক্স নিয়ে যায় সাফল্যের পথে
F.I.I.B.
IS-1075
গতানুগতিক থেকে স্বতন্ত্র ফ্যাশন
MORARJEE MILLS